দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭৪ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা।। ১৬ মে, ২০২২।। ১ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

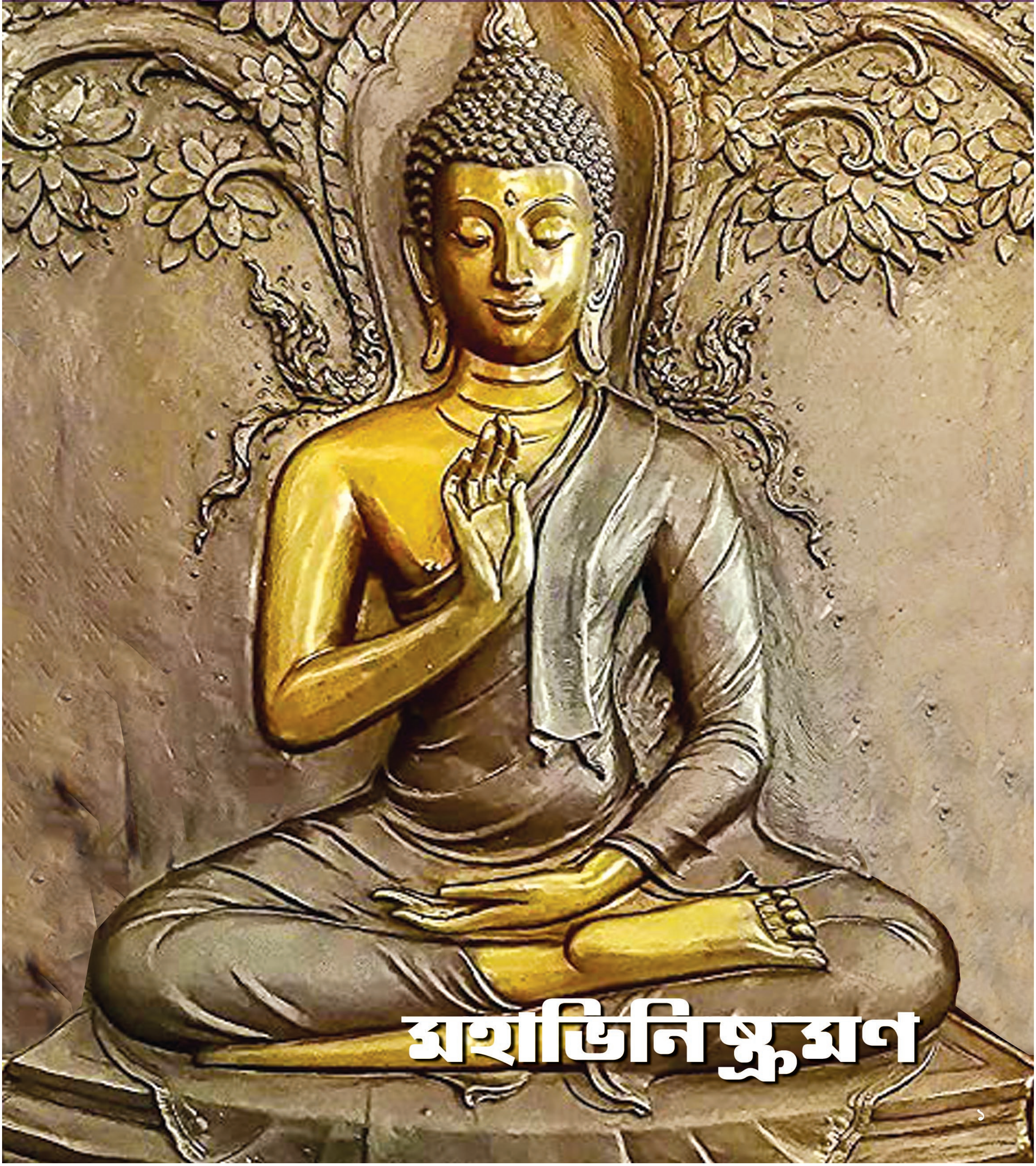

মহাভিনিষ্ক্রমণ

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**

E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা, ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১৬ মে - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,
Website : www.eswastika.com

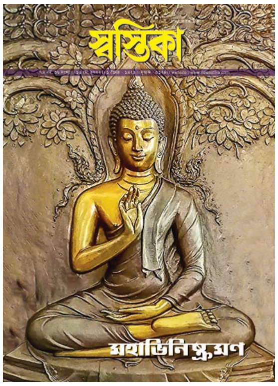

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা
সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
দাম : ১২ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫
অভিষেকের হাতেই কি বৃদ্ধ তৃণমূল বধ ? তাই বিজেপিকে 'শূন্য থেকে শুরুর আহ্বান ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬
দিদিই শুধরে নেবেন ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭
মুদ্রাস্ফীতিও কিন্তু খুবই ছোঁয়াচে ☐ অভিষেক বড়ুয়া ☐ ৮
রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন নয় কেন ! প্রশ্ন সামাজিক সংগঠন থেকে রাজনৈতিক মহলের ☐ জয়দীপ রায় ☐ ১০
রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বিশ্বভারতীর আধার হোক ভারতীয়ত্ব ☐ পিন্টু সান্যাল ☐ ১১
অন্ধকার রাতের বুক চিরে ছুটে চলল সুভাষের গাড়ি ☐ সুজিত রায় ☐ ১৩
শ্রীচৈতন্য না থাকলে বাঙ্গলা বাঁচতে পারত না ☐ ড. জিষ্ণু বসু ☐ ১৫
রামায়ণের বানরেরা ছিল ছদ্মবেশী ক্ষত্রিয় ☐ সন্দীপ চক্রবর্তী ☐ ১৭
ভারতের বিভিন্ন স্থান, স্থাপত্য ও সংস্থার পূর্বের নাম ফিরিয়ে আনা হোক ☐ ধীরেন দেবনাথ ☐ ২০
মানব কল্যাণের জন্য রাজ্যপাট ছেড়েছিলেন যে রাজকুমার ☐ নিখিল চিত্রকর ☐ ২৩
মানবপ্রেমিক মহামানব তথাগত বুদ্ধ ☐ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ☐ ২৫
যশোধরার আলোয় উজ্জ্বল বুদ্ধের সাধনপথ ☐ অনন্যা চক্রবর্তী ☐ ২৮
বর্ষায় ত্বকের সমস্যা মানসিক চাপ বাড়িয়ে দেয় ☐ ডাঃ ইমরান ওয়ালি ☐ ৩০
কেমব্রিজের ডাক পেয়েও দেশকে ভোলেননি সি.ভি. রমন ☐ দীপক খাঁ ☐ ৩১
গুরুভায়ুর মন্দিরের মাহাত্ম্য ☐ কৌশিক রায় ☐ ৩৩
শাস্ত্রমতে গোমাতা হিন্দুদের সাত মাতার অন্যতম ☐ দীপক কুমার পর্বত ☐ ৩৪
উত্তরপ্রদেশে জাতপাতের ফর্মুলা উলটে দিয়েছে বিজেপি ☐ দুর্গাপদ ঘোষ ☐ ৩৫
গীতা ও রামায়ণ-মহাভারতে রয়েছে মূল্যবোধের শিক্ষা ☐ তরুণ কুমার পণ্ডিত ☐ ৩৮
ভারতীয় ইতিহাসে নোবেল চুরি 'ন্যাশনাল মিস্ট্রি' ☐ হীরক কর ☐ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ অন্যরকম : ৩৯ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯ ☐ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
২৩ মে
২০২২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
২৩ মে
২০২২

শিশুর হাতে মোবাইল তুলে দেবেন না

অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চা কাঁদছে আর বাড়ির বড়রা তাকে ভোলানোর জন্য তার হাতে মোবাইল ফোনটা তুলে দিচ্ছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার মোবাইল নিয়ে খেলতে খেলতে অধিকাংশ শিশুর কান্না থেমেও যায়। আর এখান থেকেই শুরু হয় বাচ্চাটির মোবাইল ঘাঁটার অভ্যেস। কারণে অকারণে তখন সে মোবাইল পাওয়ার আবদার করে। ধীরে ধীরে সে মোবাইলেই বুঁদ হয়ে থাকবে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার পড়াশোনা, কেরিয়ার। শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনাও প্রবল।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা।

দাম একই থাকছে, বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার পাঠক, গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের জানানো হচ্ছে যে, বিশেষ কারণবশত আগামী ৪ জুলাই, ২০২২ সংখ্যা থেকে স্বস্তিকা'র প্রতি কপির মূল্য ১৬.০০ টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭০০.০০ টাকা করা হচ্ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বস্তিকার মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতে হলো, এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

আশাকরি আপনারা আমাদের অসুবিধার কথা অনুভব করে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন।

আগামী জুলাই মাস থেকে স্বস্তিকায় দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ঠিকানায় পাঠাবেন—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name : **INDIAN OVERSEAS BANK**

Sreemani Market Branch, Kolkata - 700 006

সারদা প্রসাদ পাল
প্রকাশক, স্বস্তিকা

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভারততীর্থ

এক সময় ভারতবর্ষ বিশ্বগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারত-সন্তানরাই ভারতবর্ষের এই উত্তরণ ঘটাইয়াছিলেন । তখন ভারতবর্ষ বিশ্বের সমস্ত দেশকে তাহার পুণ্য সাধনার পথে আহ্বান করিয়াছিল। সেই অহ্বানে সাড়া দিয়া সমগ্র বিশ্ব ভারতবর্ষে মিলিয়াছিল। ভারতবর্ষও তাহার যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ সমস্তই বিশ্বে মিলাইয়া দিয়া সমগ্র বিশ্বের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়া ভারততীর্থ হইয়া উঠিয়াছিল। ভারত-সন্তানরা যুগে যুগে কালে কালে ঋষিগণের সাধনালব্ধ উপলব্ধিগুলিকে যুগানুকূল করিয়া সমাজে প্রচলিত করিয়াছেন। ইহার জন্য প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁহারা বিদ্রোহী হইতেও দ্বিধা করেন নাই। এই জন্যই ভারতবর্ষ চির পুরাতন অথচ নিত্য নূতন থাকিয়াছে। এই জন্যই ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতি চির প্রবহমান থাকিয়াছে। অচলায়তনে পর্যবসিত হইতে পারে নাই। ইহা ভারতবর্ষীয়দের পক্ষে অতীব গৌরবের কথা। ভারতবর্ষীয় সমাজজীবনে ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে হেলায় ত্যাগ করিয়া মানব কল্যাণার্থে বহু সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এই রকম একজন প্রতিবাদী সংস্কারক হইলেন তথাগত বুদ্ধ। যখন যিশুখ্রিস্ট ধরাধামে আবির্ভূত হন নাই, তাহারও পাঁচশতাধিক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদগুলিতে 'বুদ্ধং শরণম্ গচ্ছামি, ধম্মং শরণম্ গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণম্ গচ্ছামি' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া দলে দলে মানুষ মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। তথাগত বুদ্ধ মুক্তিকামী মানুষের মনে আত্মশক্তির জাগরণ ঘটাইয়াছিলেন। তিনিই মানুষকে প্রথম দেবতার আসনে উন্নীত করিয়াছিলেন। সমস্ত জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়া এই ক্ষণজন্মা পুরুষ মানব কল্যাণে যে দীপশিখা প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সেই নবধর্মের আলোক সমগ্র ভারতবর্ষকে বারোশত বৎসর আলোকিত রাখিয়াছিল। তিনি এশিয়া মহাদেশের আলোক শিখায় পরিণত হইয়া সমগ্র বিশ্বকে ভারতবর্ষের পদপ্রান্তে উপনীত করিয়াছিলেন।

মধ্যযুগের ঐতিহাসিক ক্রান্তিলগ্নে যখন মানবতা পদদলিত, নারীজাতির সম্মান ভূলুণ্ঠিত, সমাজের অন্তেবাসীরা মনুষ্যত্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত, তখন মনুষ্যত্বের নূতন মহিমা ঘোষণা করিয়া মানুষের অন্তরতম সত্যকে ভক্তির আলোকে দিব্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। ইসলাম মতাবলম্বী বিদেশি অত্যাচারী লুঠেরার দল যখন সমগ্র বঙ্গদেশে ত্রাহি ত্রাহি রব তুলিয়া সমাজকে তিনশত বৎসর নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিয়াছিল, তখন নবদ্বীপের এক টুলো পণ্ডিত প্রবল প্রতিবাদী মূর্তিতে বঙ্গজীবনে চৈতন্য সঞ্চারিত করিয়া আবির্ভূত হইলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে। ইহার জন্য তাঁহাকেও মহাভিনিষ্ক্রমণ করিতে হইয়াছে। তাঁহার প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে হরিনাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়া এক মহা ভ্রাতৃভাব সংঘটিত হইয়াছিল। কারণ, মধ্যযুগে ধর্মই ছিল গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ পন্থা। আজি হইতে পাঁচশত বৎসর পূর্বে মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া সেই কর্মটিই মহাপ্রভু অত্যন্ত দক্ষতার সহিত করিয়া গিয়াছেন। আজ পাশ্চাত্যের বহু মানুষ তাঁহার প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে মাতোয়ারা হইয়াছেন।

একেবারে আধুনিককালে ভারতমাতাকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের অভিলাষে মহাভিনিষ্ক্রমণের নায়ক হইলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁহার এই পর্বটি শুধু রোমহর্ষকই নহে, রূপকথাও ইহার তুলনায় ম্লান হইয়া পড়ে। বস্তুত, আজ যে স্বাধীনতা আমরা ভোগ করিতেছি, তাহা নেতাজীরই চিরদিনের জন্য গৃহত্যাগের বিনিময়ে। শত ঝড়ঝঞ্ঝা অতিক্রম করিয়াও ভারতবর্ষ যে আজও স্থির রহিয়াছে, তাহা এইসব ভারত-সন্তানদের মহান কর্মসমূহের ফলস্বরূপ। তাঁহারা তাঁহাদের তপস্যার আসন হইতে উঠিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগ করিয়া নিজেদের প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁদের সেই প্রকাশেই ভারতবর্ষ আলোকিত হইয়া ভারততীর্থ হইয়া উঠিয়াছে।

সুভাষিতম্

যদ্দূরং যদ্দুরারাধ্যং যচ্চ দূরে ব্যবস্থিতম্।

তৎসর্বং তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্।।

কোনো বস্তু যতই দূরে থাকুক না কেন, যতই দুর্লভ হোক না কেন এবং তা আমাদের আয়ত্তের বাইরে থাক না কেন, কঠিন তপস্যা অর্থাৎ পরিশ্রমের ফলে তাকেও লাভ করা যায়।

অভিষেকের হাতেই কি বৃদ্ধ তৃণমূল বধ? তাই বিজেপিকে 'শূন্য থেকে শুরু'র আহ্বান শাহ-র

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

তাঁর বিরুদ্ধে অবৈধ পাচার আর বেআইনি সম্পত্তি করার তাগড়া অভিযোগ রয়েছে। তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংসদ ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। দলের সুপ্রিমো আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী। এনফোর্সমেন্ট তাঁকে ১৭ ঘণ্টা জেরা করেছে। ইডি দপ্তরে ১১৫২ পাতার উত্তর পাঠিয়েছেন অভিষেক। বিভিন্ন অছিলায় ২১-২২ মার্চের জেরা এড়িয়েছেন। ফেরার হয়ে এখন ভানাটু দ্বীপের বাসিন্দা তার ডানহাত যুব সম্পাদক বিনয় মিশ্র। সে নাকি অভিষেকের সমস্ত কুকীর্তির সাক্ষী। তাকে ধরলেই কেল্লাফতে। আপাতত মিশ্র কোম্পানি— বিনয়ের ভাই বিকাশ, সাগরেদ পুলিশ অশোক আর অনুপ মাঝি 'লালা'কে ধরে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছে সিবিআই আর ইডি। অভিষেকের স্ত্রী রুজিরা নারুলার বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। নিজে অভিযুক্ত হলেও অভিষেক কিন্তু দলকে দুর্নীতিমুক্ত করার হুংকার ছাড়ছেন। দুর্নীতি গভীরে তাই তাতে কেউ কান দিচ্ছে না। দলের শৃঙ্খলা কমিটি পালটেছেন মমতা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে সরিয়ে সুব্রত বক্সিকে মাথায় বসানো হয়েছে। মমতা জানিয়েছেন তিনি সব দেখবেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া বৈঠক ডাকা যাবে না। আগামীতে পার্থবাবু বোধহয় সমস্যায় পড়তে চলেছেন। শীঘ্রই নিয়োগ দুর্নীতিতে পাঁচ সপ্তাহের আইনি ছাতার মেয়াদ শেষ হচ্ছে। পার্থবাবুর ছুটি হয়ে গিয়েছে। তিনি অবশ্য গুরুত্বহীন মহাসচিব থেকে গিয়েছেন। এই মুহূর্তে তৃণমূলের ২০ সদস্যের জাতীয় কমিটির চারজন অভিযুক্ত। অনুব্রত মণ্ডল, অভিষেক, পার্থবাবু আর মলয় ঘটক। ঝুলে

রয়েছেন ফিরহাদ হাকিম আর নারদা কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত কাকলি ঘোষদস্তিদার। ফেব্রুয়ারি মাসে যে সপ্তরথী অভিষেক নিধনে ব্রত নিয়েছিল দু'জন এর মধ্যে রয়েছেন। জাতীয় কমিটিতে চারজন। রাজনৈতিক মহলের তাই ধারণা। তাঁদের আঘাতে এক সপ্তাহের জন্য হলেও অভিষেক তাঁর সর্বভারতীয় পদ খোয়ান। মমতা সব পদ বিলোপ করে দেন। অভিষেককে ভোঁতা করতে রাজ্য থেকে আইপ্যাক সংস্থাকে তাঁরা বিতাড়নের ছক কষেছিলেন। মহাভারতের অভিমন্যু চক্রব্যূহ ভেদ করেও বেরোতে পারেননি। অভিষেক পারেন। কৃষ্ণরূপে পিসি তাঁকে সাহায্য করেছিল। সেই থেকে দলের বৃদ্ধচক্র ভাঙতে বদ্ধপরিকর অভিষেক। আগামী ২০ মে থেকে ব্লক ও জেলা কমিটি গঠনের কাজ শুরু করবে তৃণমূল। মমতা জানিয়েছেন আসন্ন পঞ্চায়েত কোনো গোষ্ঠীবাজি বরদাস্ত হবে না।

রাজ্য বিজেপিও জুন-জুলাই থেকে দলের সাংগঠনিক খোলনলচে পালটানোর কাজ শুরু করছে। তৃণমূলের দু'ফলা মমতা আর অভিষেকের গুঁতোয় আপাতত ধুঁকছে রাজ্য বিজেপি। গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সম্প্রতি তাঁর চার মন্তব্যে রাজ্য বিজেপি দপ্তরে বোমা পড়ে। তিনি সব দাবিতে জল ঢেলে দলকে নতুন করে শুরু করতে বলেন। জানান— (১) রাজ্যে লড়াইয়ের রোল মডেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য বিজেপি নেতারা তাঁকে অনুসরণ করুন। মমতা যেভাবে লড়াই করে সিপিএম হটিয়েছিলেন, এখানকার বিজেপি নেতাদের সেভাবেই করতে হবে, (২) ইডি, সিবিআই রাজনৈতিক অস্ত্র নয় যে তাদের ব্যবহার করা যাবে, (৩) বিপুল জনসমর্থনে আসা সরকারের বিরুদ্ধে ৩৫৫ বা ৩৫৬ ধারা ব্যবহার করা যায় না। রাজ্য বিজেপি নেতারা অহরহ তা দাবি করেন। (৪) রাজ্য বিজেপিকে শূন্য থেকে শুরু করতে হবে আর গোষ্ঠী ঝগড়া ছেড়ে সংগঠনকেই মানতে হবে। কয়েকটি উপনির্বাচন আর পৌরভোটের ফলে বোঝা গিয়েছে রাজ্য বিজেপি দুর্বল হয়ে গিয়েছে। শাহ বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা আর দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটি সংসদীয় বোর্ডের প্রধান সদস্য। তার মুখে এধরনের কথা শুনে অনেকটা অস্বস্তিতে রাজ্য বিজেপি। শাহ বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। না ভেবে কিছু বলেন না। যেমন সিএএ-র বিষয়। ২০১৯ থেকে ঝুলিয়ে রেখেছেন। অনেকে তাঁকে চাণক্য বলেন। তাহলে তৃণমূল নেতার মতো কথা বলে কীসের ইঙ্গিত দিলেন চাণক্য? অনেক আগেই জানিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রুখে দাঁড়ালে কিছু করা যায় না। তাই মুখ্যমন্ত্রীকে ভাঙুন। তবেই সফলতা। □

দিদিই সব শুধরে নেবেন

সুন্দর মৌলিক

প্রিয় দিদিভাই,

নিরলস সাহিত্য সাধনার জন্য আপনি যে পুরস্কার পেয়েছেন তার জন্য শুভেচ্ছা। কিন্তু দিদি, 'এপাং ওপাং ঝপাং' লেখাই কি আপনার কাজ? কবি হিসেবে সফল দেখার জন্য তো আমরা আপনাকে ভোটে জিতিয়ে আনিনি। আমরা সুরাজ চেয়েছিলাম। আমরা খেয়ে, পরে সুখে থাকতে চেয়েছিলাম। দিকে দিকে যখন খুন, ধর্ষণ চলছে তখন আপনার পক্ষে হাত বাড়িয়ে কবির সম্মান গ্রহণ করা সত্যিই লজ্জার ছিল। আপনি তাই সে কাজ পারিষদদের দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন। বেশ করেছেন! ঠিক একই ভাবে পারিষদদের দিয়ে কাজটাও করিয়ে নিন।

মাফ করবেন দিদি, আজ একজন ভাইয়ের থেকে বেশি রাজ্যের সাধারণ নাগরিক হিসেবে এই চিঠি লিখছি। তৃতীয় দফার শাসনকালের প্রথম বর্ষপূর্তিতে আপনি বলেছেন, 'সব শুধরে নেব'। কিন্তু আমরা তো এটা শুনতে চাইনি। আপনি এক অর্থে স্বীকার করেছেন যে সত্যিই সব কিছু ঠিক নেই। অনেক কিছুই শুধরে নেওয়া আশু প্রয়োজন। গত এক বছরে এত কিছু কারণে রাজ্যের মানুষ বিক্ষুব্ধ, বিষণ্ণ ও অবসন্ন যে এখন আর 'সব শুধরে নেব' শোনার অপেক্ষায় নেই কেউ। তৃতীয়বার নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী যখন বলেন 'সব শুধরে নেব', তখন প্রশ্ন উঠতেই পারে এতদিন কি আপনি চোখ বুজে ছিলেন? দুর্নীতির পাহাড় নিয়ে যখন আদালতে একের পর এক সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে তখন আপনি শোধরানো আশ্বাস দিচ্ছেন কেন? তবে কি সবাই চুপ করে থাকলে আপনি আদৌ শুধরে নেওয়ার কথা ভাবতেন না?

সবার আগে এই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি। আগে থেকেই মন্দ ছিল বলতে পারেন। বাম আমল থেকেই। আপনি যেটা সব সময় বলতে পারেন। কিন্তু গত এগারো বছরে কি সেই দুর্নাম ঘুচিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল

না? এখন ভিনরাজ্যে পা রাখলে বাঙ্গলার নামে শুনতে হয় যে, দেশের মধ্যে অন্যতম প্রধান বিশৃঙ্খল রাজ্য। একে নিছক শত্রু বিজেপির প্রচার বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। সমালোচকদের 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' সমালোচনা বলেও দেগে দেওয়া যাবে না। এটা বাস্তব। নেট মাধ্যমের যুগে গোটা বিশ্ব এক মুহূর্তে জেনে যায় পৃথিবীর কোন প্রান্তে কী ঘটছে। বাঙ্গলার লজ্জা তাই বাঙ্গলায় সীমাবদ্ধ নেই আর।

রাজ্যে এত অস্ত্রের ঝনঝনানি কেন দিদি? এর উৎস কোথায়? আপনি বলবেন অন্য রাজ্য থেকে ঢুকছে। কিন্তু কী করে ঢুকছে, কারা ঢোকাচ্ছে সেই সত্যটা তো আপনাকেই বলতে হবে। আপনি নিজেই প্রকাশ্য বৈঠকে বলছেন, পুলিশের বিশ্বাসযোগ্যতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা নেই এই রাজ্যে। আপনাকে এর জন্য সত্যবাদী বলা যাবে কিন্তু সুপ্রশাসক বলা যাবে কি! রাজনৈতিকভাবে পুলিশকে প্রভাবিত করার চেষ্টা সিপিএম আমলেও ছিল। তখন যদি এটা অনাচার হয়ে থাকে তবে এখনও তা অন্যায়। তৃণমূল আমল বলে তো আর আপনি চোখ বন্ধ করে থাকতে পারেন না?

দিদি, কবি হিসেবে আপনি পুরস্কৃত। এর জন্য গর্বের পাশাপাশি লজ্জাও লাগছে। আসলে আপনি ভালো কবিতা লিখবেন বলে তো আর আপনাকে ক্ষমতায় আনা হয়নি। আমরা চেয়েছিলাম অন্য কিছু। আজকের বাঙ্গলায় আক্রমণ, ধর্ষণ, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, হত্যার কাহিনি বেড়েই চলেছে। এর প্রভাব পড়ছে রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির উপরে। উন্নয়ন নেই। দিশাহীন রাজনীতি দেখে শিল্পোদ্যোগ নেই। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রের অবস্থাও তথৈবচ।

দিদি, একদিন আপনি বরং বিরোধী নেত্রী হিসেবে গোটা বিষয়টাকে দেখুন। একবার ভেবে দেখুন আপনি নয়, আপনার দল নয়, অন্য কেউ রাজ্য চালাচ্ছে। আপনি চুপ করে বসে থাকতে পারতেন না। দিদি, আপনাকে সবাই বামশাসন মুক্ত রাজ্য বানাতে দিয়েছিল। বামেদের অনুকরণ দেখার জন্য নয়। কবিতায় নয়, বাঙ্গলার জীবনে ছন্দ আনুন। না পারলে, ছেড়ে দিন। ☐

বিশেষ ঘোষণা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ বাঙ্গলায় গত ১৯৩৯ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে। সেই কাজে বাঙ্গলা তথা ভারতের বহু কার্যকর্তা ও প্রচারকের পরিশ্রম নিহিত আছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রয়াত, অনেকে খুবই বৃদ্ধ। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বাঙ্গলার সঙ্ঘকাজের প্রারম্ভিক ইতিহাস তুলে ধরা প্রয়োজন। এই কাজ স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট হাতে নিয়েছে। আগামী শুভ জন্মাষ্টমী, ২০২২ তিথিতে **'বাঙ্গলায় সঙ্ঘের কাজের ইতিহাস'** নামক এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে চলেছে। সহযোগ রাশি ২৫০৲ টাকা। প্রকাশপূর্ব রাশি ১৫০৲ টাকা।

বিস্তারিত পরে জানানো হচ্ছে। প্রকাশ পূর্ব রাশি দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, ২০২২।

অতিথি কলম

মুদ্রাস্ফীতিও কিন্তু খুবই ছোঁয়াচে

অভিষেক বড়ুয়া

বিগত মার্চ মাসে ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি ৭ শতাংশ ছুঁয়েছে। অর্থনীতিবিদদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী এই বৃদ্ধি আরও বাড়ার সম্ভাবনা। কেননা বিশ্বব্যাপী কাঁচা তেল, বিভিন্ন ধাতু ও কৃষিজাত পণ্যের বাজারে ইউক্রেন যুদ্ধ প্রলম্বিত হওয়ার কারণে সরবরাহে আরও ঘাটতি পরিলক্ষিত হবে।

ভবিষ্যৎ পর্যালোচনাকারীরা বলছেন, এই মুদ্রাস্ফীতি জুন অবধি ৭ শতাংশ থাকবে তো বটেই, সর্বোচ্চ সীমায় তা ৮ শতাংশও ছুঁতে পারে। পাইকারি মূল্যহার যার অর্থ কারখানা থেকে বেরোন মাল, চাষির ঘর থেকে বেরোন শস্যের কোনো হাত পালটানোর আগেই যে বৃদ্ধি দেখাচ্ছে তা আরও চিন্তাজনক। পাইকারি মুদ্রাস্ফিতির হার মার্চ মাসে ১৪.৫৫ শতাংশ।

কথা হচ্ছে, অতীতে যখন মুদ্রাস্ফীতির হার আরও আকাশ ছোঁয়া ছিল তখন এত মাথা ঘামানো হয়নি, তাহলে এই ৭ শতাংশ নিয়ে এত অস্থির হবার কী আছে? উদাহরণস্বরূপ ২০১৩ সালে ভোগ্যপণ্যের মুদ্রাস্ফীতি ১২ শতাংশ পেরিয়ে গিয়েছিল। ২০১০ সালের শুরুর সময় ও তার বেশ কিছু পরে অবধিও যে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি চলেছিল তার পরিণতিতে গৃহস্থের সংসারে এবং কারবারি ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যা ও টানাটানির সৃষ্টি হয়, আজকের তারিখে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির যে সমগোত্রীয় লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাতে অতীতের যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেই জন্যই সরকার দ্রুত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিতে তৎপর।

বস্তুত, ২০১০-এর দশকের গোড়ার দিকে সরকারের তরফে নীতিগতভাবে অর্থনৈতিক কাঠামোকে ঢেলে সাজাবার উদ্যোগ নেওয়া হয় যাতে মূল্যবৃদ্ধি বাগে থাকে। এর পরিণতিতে প্রধান বিষয় যেটা সরকার আরবিআই-কে জানিয়ে দেয় যে মুদ্রাস্ফীতিকে ২ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যবিন্দু বা ৪ শতাংশের মধ্যে ধরে রাখতে হবে। লক্ষণীয়, এবারের ৭ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি সেই আপার লিমিটকে (৬ শতাংশ) পার করেছে। আরবিআই-এর তরফে কি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার নয়?

সাধারণত মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সর্বোচ্চ ব্যাংকের (আরবিআই)-এর হাতে সর্বদাই কিছু ব্যবস্থা প্রস্তুত থাকে। যাকে প্রায় ফর্মুলাই বলা যায়। এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে কোনো জিনিসের হঠাৎ দাম বেড়ে যাওয়ার কারণ অর্থনীতিতে অস্বাভাবিক উন্নতি বা বৃদ্ধি (আয় বৃদ্ধি) যার ফলে জিনিসপত্তরের চাহিদাও বেড়ে যায় অথচ বাজারে অত মাল নেই। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে বেকারত্বও হ্রাস পেয়েছে। অর্থনীতির সূত্র অনুযায়ী এসব ক্ষেত্রে কারবারিদের ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে গেলে সুদ বাড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে লগ্নিকরা অর্থের পরিমাণ কম হয়। অন্যদিকে সাধারণ উপভোক্তারাও ব্যাংকের সুদ বেশি হওয়ায় কম ঋণ নেয় ও উপভোক্তার হাতে অর্থের জোগান কমে যায়। একই সঙ্গে তারও ক্রয় করার প্রবণতা ও ক্ষমতা দুটোই কমে আসে।

উদাহরণ দিলে এটা আরও সহজে বোঝা যাবে। আজকাল বাড়ি, গাড়ি, ল্যাপটপ সবই অধিকাংশ মানুষ ব্যাংক ঋণে নিয়ে মাসিক কিস্তিতে তা শোধ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বাড়িয়ে দিলে ব্যাংক থেকে ধার করতে গেলে বেশি টাকা সুদে আসলে দিতে হবে। যারা বাড়ি বা গাড়ি কেনার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন তাঁরা একটু ধীরে চল নীতি নেবেন। হঠাৎ করে ব্যাংকের ঋণ আগামীকালই নেবে না। শুধু যদি গাড়ির কথাই ধরা যায়। মাসিক কিস্তির পরিমাণ যদি বাড়তি সুদের জন্য বেড়ে যায় আর সকলেই ধার নেওয়া থেকে বিরত থাকে তাহলে গাড়ির বিক্রি তো নিশ্চিত ভাবে কমবে। গাড়ি উৎপাদনকারীরা তাদের মজুত করা গাড়ি বেচতে গাড়ির দাম কমাতে বাধ্য হবে। চাহিদা হঠাৎ করে পড়ে গেলে এমনটা হতে বহুবার দেখা গেছে। এক্ষেত্রে উৎপাদনকারীরা দাম বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতিতে ঘি ঢালার কথা ভাবতেই পারবে না। এখন কাল্পনিকভাবে গাড়ির জায়গায় অন্য সবরকমের পণ্য ও সার্ভিস সেক্টরের প্রযুক্তিগত কাজকর্মকেও মিশিয়ে দিন। খুব সহজেই বুঝতে পারবেন ব্যাংকের সুদের হার বাড়ালে প্রত্যক্ষ বাজারে তার কী পরিণতি হয়।

একই ধরনের আর একটি সিদ্ধান্তও রয়েছে, বাজারে অর্থের জোগান কমিয়ে দেওয়া। অর্থশাস্ত্রের প্রাথমিক নিয়ম অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতির অর্থ অনেক বেশি টাকা অনেক কম জিনিস কিনতে ছুটছে। এখন দেশের টাকার একমাত্র জোগানদার আরবিআই যদি বাজারে টাকা ছাড়ার পরিমাণ কমিয়ে দেয় তাহলে এখন অনেক কম টাকাই সেই একই পরিমাণ মাল কিনতে ছুটবে। সবার হাতেই কম টাকা থাকলে মালটা কিনবে কে? অবশ্যই জিনিসের দাম কমবে অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির দাপট কমে টাকা শক্তিশালী হবে।

কিন্তু অন্য একটা প্যাঁচানো দিকও আছে। এমনও সময় আসে যখন চাহিদা না বেড়ে হঠাৎ করে বাজারে জিনিসপত্রের সরবরাহ কমে যায়, ফলে অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে দাম বেড়ে যায়। এর চলতি নাম সাপ্লাই সাইড ইনফ্লেশান। সামনেই উদাহরণ রয়েছে। কোভিডের সময় বহু কারখানায় উৎপাদন বন্ধ হয়ে বাজারে মাল আসেনি বা বাজার থেকে ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে হঠাৎ করে রাশিয়ান তেলের উবে যাওয়া। তেলের দামে সকলেই তা টের পাচ্ছেন। এই ধরনের অভাবগুলির ফলে অর্থনীতিতে খুবই খারাপ জিনিস stagflation দেখা যায়। এটি বহু আন্তর্জাতিক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক চাহিদা জোগানের ভারসাম্য ফিরতে দীর্ঘ সময় লাগে। এমন একটা সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার বাড়ানো অনেক সময়ই backfire করতে পারে। অর্থাৎ অর্থনীতিতে কম ঋণ নেওয়ার ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়া নিস্তেজ হয়ে উৎপাদিত বস্তুর পরিমাণ কমিয়ে দেয় অথচ মুদ্রাস্ফীতিতে কোনো হেরফের হয় না।

এখন প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এই সরবরাহে খামতিজনিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক

সাধারণত 'অপেক্ষা করো ও নজর রাখো' নীতি নিয়ে চলাই পছন্দ করে। অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যতক্ষণ না সরকারের ঘাটতি স্বাভাবিক হয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে করোনার সময়ের কথাই বলা যায়। এই সময় মুদ্রাস্ফীতি ৬ শতাংশ ছুঁলেও (মে ও জুন ২০২১) আরবিআই সুদের হার বাড়ানো থেকে বিরত ছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আশা করছিল কলকারখানা খুললে কাজে যোগদান শুরু হলেই সরবরাহ স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

কিন্তু আজকের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আরবিআই তার অবস্থান পালটে সুদের হারে বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। এখন প্রশ্ন ওঠে, ব্যাংকের এই সিদ্ধান্ত কি সঠিক? উত্তরে বলতে হয় সম্ভবত সঠিক। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে মুদ্রাস্ফীতি সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যার কারণেই ঘটেছে তবুও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বেশ কিছু 'সাবধান সংকেত' নজরে পড়েছে। এই কারণেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিছুটা সন্ত্রস্ত পদক্ষেপ নিতে চায়। এবং এমন পদক্ষেপ যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত এমনটা বোঝা যায়। আর এই ফ্রন্টে আরবিআই-এর ধারালোতম অস্ত্র সুদের হার।

অন্যদিকে অতীতের বহুবারের অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে দীর্ঘদিন ধরে অর্থনীতির শিরোনামে থাকা মুদ্রাস্ফীতির যদিও তা খাদ্যবস্তু ও জ্বালানির দামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও গৃহস্থ নাগরিক ও ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে একটা 'এই বোধ হয় দাম' বাড়ল এমন একটা নেতিবাচক আবহের সৃষ্টি করে। মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত এই অতিরিক্ত উদ্বেগ পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক হওয়া থেকে দূরে ঠেলে দেয়। মুদ্রাস্ফীতি সগর্বে বেঁচে থাকে। ভারতে ঠিক এটাই রয়েছে।

অবশ্যই দ্বিতীয় কারণটি হলো সরবরাহ ক্ষেত্রে ঘাটতি দীর্ঘায়িত হওয়া যা সরকারকে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করল। একথা জোর দিয়ে বলা যায় ইউক্রেন যুদ্ধের অভিঘাত চটজলদি কেটে যাওয়ার লক্ষণ নেই, এটি প্রলম্বিতই হতে পারে। ফলশ্রুতিতে জ্বালানি তেলের দামে বৃদ্ধি ও শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়ায় খাদ্যবস্তু ইত্যাদির ঘৃণ্য বৃদ্ধিও চলমান থাকারই সম্ভাবনা। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতিজনিত চাপ থাকবেই।

অন্যদিকে চীনের কোভিডের ক্ষেত্রে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণের ফলে বিশ্বের সর্ববৃহৎ উৎপাদনকারী দেশ তাদের উৎপাদনে ব্যাপক ছাঁটকাট করেছে, যা অদূর ভবিষ্যতে করোনা ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত জারি থাকবে। এর পরিণতিতে ব্যবহারিক বস্তুর ঘাটতি অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়বে। মালের ঘাটতি ব্যাপক ক্ষেত্রেই প্রসারিত হবার আশঙ্কা।

দীর্ঘ অর্থনৈতিক গতিবিধির অনুশীলনে এটাই দেখা গেছে যে দীর্ঘস্থায়ী মুদ্রাস্ফীতির উপস্থিতি কালক্রমে নানাবিধ ভোগ্যপণ্যের ওপরই থাবা বসায়। যেগুলির দাম বাড়তে থাকে, এর ফলে উপভোক্তারা আর কেবলমাত্র পেট্রোল পাম্প বা ১ কেজি আটা কিনতেই বেশি পয়সা দেয় না আরও বহুবিধ নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর দাম ছোঁয়াচে রোগের মতোই বাড়তে থাকে। অন্য যে কোনো ধরনের সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয় না।

অর্থনীতিবিদরা সাধারণত জ্বালানি তেল ও খাদ্যবস্তুকে তাদের বিশ্লেষণের পরিধি থেকে সরিয়ে রাখেন। এই দুটি বিশেষভাবে প্রবণতাময় বস্তুগুলি ছাড়া তাঁরা core inflation নিয়ে বেশি চিন্তা করেন। এই কোর বা মূলগত বস্তুগুলি বোঝাতে তাঁরা অন্য সমস্ত কিছু জিনিসপত্র ও সেবা ক্ষেত্রগুলিকেও ধরেন যাতে বোঝা যায় মুদ্রাস্ফীতি কতটা সর্বগ্রাসী হয়েছে। এই মূলগত মুদ্রাস্ফীতি ভারতে কিন্তু যথেষ্ট উচ্চসীমায় এবং দীর্ঘসময় ধরে অবস্থান করেছে। অনুমান অনুযায়ী তা আরও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

বিশ্বের দেশগুলির কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহ যে যার মতো করে এর মোকাবিলায় কাজ করছে। অনেকের সঙ্গেই অনেকের মতের মিল নেই। আমেরিকার federal reserve সম্ভবত ২ শতাংশ হারে সুদ বাড়াতে চলেছে। অন্যদিকে আরবিআই অতটা কঠিনভাবে আচমকা বেশি সুদ বাড়াবার পক্ষপাতী নয়। কারণ এর ফল অগ্রসরমান অর্থনীতি থমকে যেতে পারে। তবে একটা বিষয় নিশ্চিত যে ঋণ নেওয়ার খরচ বাড়া ও থাকলে শোধ করার খরচ বাড়তে চলেছেই এবং তা ছাড়া পথ নেই।

(লেখক এইচডিএফসি ব্যাংকের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা)

শোকসংবাদ

মালদা নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা সংস্কার ভারতীর দীর্ঘদিনের সভাপতি, বিশিষ্ট সংগীত শিক্ষক ও শিল্পী জগন্নাথ দে গত ৪ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র, ও বহু গুণমুগ্ধকে রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর গান একসময় দূরদর্শনে পরিবেশিত হতো। দীর্ঘদিন সংস্কার ভারতীর শিল্পীকেও গানের তালিম দিয়েছেন।

যোগ চিকিৎসা ডিপ্লোমা কোর্স

ডিপ্লোমা কোর্স অ্যাডভান্স থেরাপিউটিক হঠ এন্ড রাজযোগ
(D.A.T.H.R.Y.)

পাঠ্যসূচী ঃ ইনট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান ফিলোসফি, অষ্টাঙ্গযোগ, অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি, ফুড এন্ড নিউট্রিশন, সাম কমন ডিজিজেস, ইন্ডিয়ান ডায়াটেটিক্স, ভেষজ (হার্বাল) প্রয়োগ, ন্যাচারোপ্যাথি, রাজযোগ, ও কুন্ডলিনীযোগ, হরস্কোপ থেরাপি, মেডিটেশন প্রাকটিস, স্ট্রেস (Stress) ম্যানেজমেন্ট, যোগ প্রাকটিক্যাল (আসন - প্রাণায়াম - মুদ্রা), থেরাপিউটিক ম্যাসাঝ (যৌগিক ও ফিজিওথেরাপি), স্ট্রেচিং, যৌগিক - চিকিৎসা (ট্রিটমেন্ট), প্রাকটিস টিচিং।

সময়কাল ঃ ১ বছর। ২৬শে জুন থেকে আরম্ভ।
যোগ্যতা ঃ ১৮ বছর বয়স ও সর্বনিম্ন মাধ্যমিক পাশ।
ক্লাস ঃ প্রতি রবিবার ১টা থেকে ৪টা।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট
1977
অব কালচার, যৌগিক কলেজ
Regd. NGO, NITI AAYOG, New Delhi, Govt. of India

কোর্স ফি ঃ ১০,০০০ টাকা। এককালীন ৮০০০ টাকা। ইনস্টলমেন্টে প্রথমে ৫০০০ টাকা, পরের মাসে ২৫০০ টাকা করে।

ফর্ম ও প্রসপেক্টাস ঃ ১০০ টাকা
১০১, সার্দান অ্যাভিনিউ, কল-২৯
9051721420 / 9830597884

রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন নয় কেন! প্রশ্ন সামাজিক সংগঠন থেকে রাজনৈতিক মহলের

জয়দীপ রায়

গত বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসা এবং প্রশাসনিক মহলে দুর্নীতির ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা এমন ভাবে ভেঙে পড়েছে যেখানে সাধারণ মানুষ আর রাজ্য পুলিশের ওপর ভরসা রাখতে পারছেন না।

আনিস হত্যাকাণ্ড, তপন কান্দু হত্যাকাণ্ড, রামপুরহাট অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা থেকে শুরু করে হাঁসখালিতে নাবালিকা ধর্ষণ-গণধর্ষণের মতো একাধিক ঘটনা রাজ্যজুড়ে ঘটে চলেছে। অথচ রাজ্যের পুলিশ নির্বিকার, তারা দলদাসে পরিণত হয়েছে। স্বজনহারা প্রত্যেকটি পরিবার, তাদের পরিবারে ঘটে যাওয়া ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে। তাদের অভিযোগ এরাজ্যের পুলিশের ওপর তাদের কোনো ভরসা নেই। রাজ্যের উচ্চ আদালতও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আক্রান্ত পরিবারগুলির আর্জিকে মান্যতা দিয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, সিন্ডিকেটরাজ থেকে শুরু করে, গোরু, কয়লা, বালিপাচার থেকে শিক্ষাক্ষেত্রেও আর্থিক দুর্নীতিতে শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীরা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছে। এমনকী শাসকদলের আক্রমণের হাত থেকে সংবাদপত্র এবং আদালতের বিচার ব্যবস্থাও বাদ যায়নি। শাসকদল অনুপ্রাণিত আইনজীবীদের পক্ষ থেকে বিচার ব্যবস্থার ওপরও আঘাত আনা হয়েছে। যেভাবে শাসকদল শাসন ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে একের পর এক সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করেছে তাতে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ও বিচার ব্যবস্থা ক্রমশ ধ্বংসের পথে যাচ্ছে।

তাতেই সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি জোরালো হতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক দলগুলো তো বটেই, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে একাধিক অরাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকেও পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি তোলা হয়েছে। ইতিমধ্যে 'ল'ইয়ার ফর জাস্টিস' নামে আইনজীবীদের একটি সংগঠনের প্রতিনিধি দল অত্যাচারিত পরিবারগুলিকে নিয়ে দিল্লির রাজপথে মোমবাতি মিছিল করে। পরে তারা রাষ্ট্রপতি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রতিনিয়ত খুন, ধর্ষণ, লুঠ, অপহরণ, সম্পত্তি লুঠ এবং অগ্নি সংযোগের মতো ঘটনার পরিসংখ্যান তুলে ধরে রাষ্ট্রপতির কাছে পশ্চিমবঙ্গে ৩৫৬ ধারা জারির আবেদন জানায়। এই মর্মে তারা রাষ্ট্রপতি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেয়। আইনজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে পরিসংখ্যান দিয়ে জানানো হয়েছে, গত নির্বাচনের পরবর্তী হিংসার ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গে তিন লক্ষ মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন। একশো জনের বেশি মানুষকে রাজনৈতিক হিংসার বলি হতে হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে একাধিক পরিবারকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। রাজ্যে একশোর বেশি মহিলা ও নাবালিকাকে ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার হতে হয়েছে। রাজ্যে হিংসার ঘটনা দিনের পর দিন যে পর্যায় বেড়ে চলেছে তাতে পশ্চিমবঙ্গে আইন ব্যবস্থা বলে কিছু নেই। সর্বত্র শাসকের আইন চলছে। অতএব অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হোক।

অন্যদিকে 'ইন্ডিক কালেক্টিভ ট্রাস্ট' নামে তামিলনাড়ুর একটি সামাজিক সংগঠন সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি জানিয়ে সুপ্রিমকোর্টে পিটিশন দায়ের করেছে। তারা তাদের পিটিশনে পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া হিংসার ঘটনার একটি খতিয়ান তুলে ধরে জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে তৃণমূল সরকার সন্ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছে তাতে সে রাজ্যে 'স্টেট অব আনরেস্ট'-এর পরিবেশ তৈরি হচ্ছে।

অন্যদিকে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, যে রাজ্যে কোনও আইনের শাসন নেই, শাসকের আইন চলছে সে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন লাগু হবে না কেন! বিরোধী দলগুলির বক্তব্য, কেন্দ্রীয় মানবাধিকার কমিশন এ রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা খতিয়ে দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। রাজ্যপাল নিয়মিত ট্যুইট করে রাজ্যের আইন ব্যবস্থার অবনতির কথা উল্লেখ করছেন। এমনকী সংসদের মধ্যে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মন্ত্রী অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গের আইন আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে গেলে প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা রয়েছে। তাহলে কেন পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ হবে না! আইন বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন! এ ব্যাপারে প্রাক্তন আইপিএস অফিসার ড. নজরুল ইসলামের বক্তব্য, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়লে রাজ্যপালের রিপোর্ট ও সুপারিশের ভিত্তিতে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসন হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছা কতটা রয়েছে সেটা দেখতে হবে। বিশিষ্ট আইনজীবী তথা কংগ্রেস নেতা অরুণাভ ঘোষ জানিয়েছেন, এরাজ্যে শাসন ব্যবস্থা যেভাবে ভেঙে পড়েছে তাতে ৩৫৬ ধারা বা রাষ্ট্রপতি শাসন লাগুর একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে ঠিকই। কিন্তু বিষয়টি এখন পরিপক্বতা লাভ করেনি। কারণ রাষ্ট্রপতি শাসন একটি জটিল প্রক্রিয়া। সেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে কী প্রভাব পড়তে পারে তারও বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। সব বিষয়টি খতিয়ে দেখে এখনই এই ধরনের পদক্ষেপ নিলে সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেতে পারে। □

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বিশ্বভারতীর আধার হোক ভারতীয়ত্ব

পিন্টু সান্যাল

মানুষের চিন্তা সম্ভাব্য যত দিকে বিস্তার লাভ করতে পারে তার কোনো দিকই ভারতবর্ষের অধরা ছিল না। সমৃদ্ধ ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আজও আমাদের অবাক করে এবং যে ভারতীয় জ্ঞানসমুদ্র বর্তমান সময়েও বহুমূল্য রত্ন উপহার দিতে সক্ষম, তার মূলে ছিল ভারতবর্ষের অতুলনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা।

চতুরাশ্রমের যে পর্যায়ে জ্ঞানের সাধনা করা হতো তার নাম— 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম'। হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে গঙ্গানদী যেমন ভারতীয় জীবনকে পুষ্ট করে কিন্তু তার অন্তিম লক্ষ্য সমুদ্রে মিশে যাওয়া ঠিক তেমনি ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা জীবনের বৈষয়িক ব্যবহারিক দিকের চাহিদা পূরণ করলেও তার অন্তিম লক্ষ্য ছিল 'ব্রহ্মোপলব্ধি'। সমৃদ্ধিশালী ভারতবর্ষের শিক্ষার এই আদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও কাজের নিবিড় যোগ। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ব্রাহ্মসমাজ'-এর প্রভাব পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের উপর। তাঁর বিভিন্ন লেখাতে উপনিষদের শ্লোকের ছড়াছড়ি। কবির নিজের কথায়—

'...বাল্যে উপনিষদের অনেক অংশ বারবার আবৃত্তি-দ্বারা আমার কণ্ঠস্থ ছিল।

...কেবলমাত্র মুখস্থভাবে না; বারংবার সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে আবৃত্তি করেছি এবং পিতার কাছে গায়ত্রীমন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েছি।'

(মানুষের ধর্ম)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো শিক্ষার লক্ষ্য ও পদ্ধতি এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের তথা উপনিষদীয় যুগের শিক্ষা দর্শন ছিল অভিন্ন। ভারতবর্ষে একদিন ধ্বনিত হয়েছিল 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। কিন্তু এই তপস্যার জন্য এক তপোভূমি দরকার— সেই সাধনার ক্ষেত্র 'ভারতবর্ষ'; সেই সাধনার জন্য যে পদ্ধতি তা 'ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতি'। রবীন্দ্রনাথ

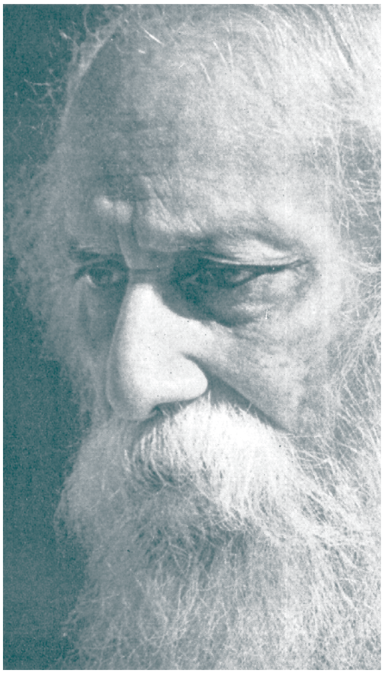

চেয়েছিলেন শিক্ষার মাধ্যমে মানবের উত্তরণ ঘটবে, সে বিশ্বমানবে পরিণত হবে— দেশের গণ্ডি পেরিয়ে সে এই বিশ্বের একজন বলে নিজেকে মনে করবে।

মানবাত্মার সঙ্গে 'বিশ্বাত্মা'র এই সংযোগ সম্ভব প্রকৃতির কোলে— এই ছিল বিশ্বকবির চিন্তা। এই বিশ্বের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে তার যোগ, সে তার আত্মীয়; পরমব্রহ্মের অংশ তারই মতো— এই উপলব্ধি জাগ্রত হলে একটি দেশ আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্য দেশকে মারণ অস্ত্র প্রয়োগে ধূলিসাৎ করবে না, বৈজ্ঞানিক উৎকৃষ্টতার প্রদর্শন ভয়াবহ অস্ত্রের মাধ্যমে হবে না। ইউরোপের বৈভবের অন্তঃসারশূন্যতা দুটি বিশ্বযুদ্ধে দেখা গেছে, বর্তমানে ইউক্রেন- রাশিয়ার যুদ্ধ আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' প্রবন্ধে বলেছেন— '...একটা কথা আমার নিজের মনে হয়েছে যে, তপোবনের শিক্ষাপ্রণালীতে একটি বড়ো সত্য আছে। যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির কোলে আমাদের জন্ম তার শিক্ষকতা থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে পারে না।'

রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষাতত্ত্ব শুধুমাত্র তত্ত্বজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি তাঁর তত্ত্বের সফল রূপায়ণ করেছিলেন শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করে। কবির এক সময় মনে হয়েছিল, সাহিত্য সৃষ্টির থেকে শিক্ষায় সংস্কারের কাজে যোগদান জরুরি। এজন্য তিনি ব্যক্তিগত জীবনে প্রিয়জন বিয়োগ, ঋণভারে জর্জরিত হয়েও নিজের শিক্ষা সংস্কারের সাধনায় অবিচল ছিলেন।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য— পারমার্থিক ও ব্যবহারিক দুইই ছিল। ব্যবহারিক জ্ঞানকে ভারতবর্ষ যে কখনোই উপেক্ষা করেনি তাঁর সাক্ষ্য পাওয়া যায় চরক-শুশ্রুতের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, আর্যভট্ট- বরাহমিহিরের জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাচীন মন্দিরগুলির স্থাপত্য, মরিচা বিহীন লোহা এবং বিশাল পণ্যবাহী জাহাজ নির্মাণে। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রয়োগ করার জন্য প্রকৃতিকে 'বশ' করে রাখতে হয়নি; প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে, শোষণ করে নয়; প্রকৃতিকে দোহন করার পদ্ধতি ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'জীবিকার লক্ষ্য শুধু কেবল অভাবকে নিয়ে, প্রয়োজনকে নিয়ে; কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতাকে নিয়ে; সকল প্রয়োজনের উপরে সে। এই পরিপূর্ণতার আদর্শ সম্বন্ধে ইউরোপের সঙ্গে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু কোনো একটা আদর্শ আছে যা কেবল পেট ভরাবার না, টাকা করবার না, এ কথা যদি না মানি, তাহলে নিতান্ত ছোটো হয়ে যাই' (আশ্রমের রূপ ও বিকাশ)।

পারমার্থিক লক্ষ্যকে চূড়ান্ত জেনে

ফ ঃ ২

ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ ছিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শন। বিশ্বকবি পুত্র রথীন্দ্রনাথকে 'কৃষিবিজ্ঞান' পড়তে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তাকে ছোটোবেলায় 'কেদারনাথ' ভ্রমণে পাঠিয়েছিলেন আত্মীয়দের সমালোচনার আশঙ্কা করেও। তাঁর নিজের কথায়— 'যখন রথীর বয়স ছিল ষোলোর নীচে তখন আমি তাকে কয়েকজন তীর্থযাত্রীর সঙ্গে পদব্রজে কেদারনাথ ভ্রমণে পাঠিয়েছি, তা নিয়ে ভর্ৎসনা স্বীকার করেছি আত্মীয়দের কাছ থেকে, কিন্তু একদিকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে অন্যদিকে সাধারণ দেশবাসীদের সম্বন্ধে যে কষ্টসহিষ্ণু অভিজ্ঞতা আমি তার শিক্ষার অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলে জানতুম তার থেকে তাকে স্নেহের ভীরুতাবশত বঞ্চিত করিনি।' আধ্যাত্মিক চেতনার বৃদ্ধি জ্ঞানলাভের সহায়ক হবে— এই ছিল রবীন্দ্রনাথের চিন্তা।

ইংরেজ আমলে 'স্কুল' হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য ন্যূনতম উপকরণ হিসেবে টেবিল, চেয়ার, ঘর ইত্যাদির যে ফর্দ বাধ্যতামূলক করা হলো, সেই দাবি পূরণ করতে না পেরে গ্রামের টোলগুলি বন্ধ হতে লাগলো। এই ঘটনা কবিগুরুর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

উপকরণের বহুলতা বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি যে সমানুপাতিক নয়, বরং প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উপকরণের বিরলতা আরও গভীরভাবে শিখতে সহায়তা করে, রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তার ফল তাঁর আশ্রম। ভারতবর্ষের সনাতন শিক্ষা পদ্ধতিকে প্রতিস্থাপন করে যে মেকলীয় শিক্ষা পদ্ধতি ইংরেজরা চাপিয়ে দিয়েছিল তার কুফল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অবহিত ছিলেন। তিনি 'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধে লিখেছেন— 'এ কাল যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যবসা ও চাকরি চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশি শিক্ষাবিধি রেলকামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত।' তাই স্বদেশের শিক্ষার ভার, 'স্বদেশী সমাজ'কেই নিতে হবে— এই ছিল তাঁর সিদ্ধান্ত, আর তাই কবিগুরু ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'-এ যুক্ত হন।

এই স্বদেশী শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে কীভাবে 'স্বদেশবোধ' জাগবে? এর উত্তর স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে— 'এই স্বদেশী প্রণালীর শিক্ষার প্রধান ভিত্তি স্বার্থত্যাগপর ভূতিনিরপেক্ষ অধ্যয়ন-অধ্যাপনরত নিষ্ঠাবান গুরু এবং তাঁহার অধ্যাপনের প্রধান অবলম্বন স্বদেশের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস।' স্বদেশের সেই ইতিহাস হবে ভারতবর্ষের দিক থেকে লেখা, কয়েক হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী যে সংস্কৃতির শিকড় ভারতবর্ষের মর্মস্থান অধিকার করে আছে তার পক্ষে লেখা। কিন্তু শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ ছিল যে 'ইতিহাস' মুখস্থ করে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয় তা ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে আক্রমণকারী বিদেশিদের মহিমান্বিত করে এবং এই 'ইতিহাস' স্বদেশের সঙ্গে যোগকে দুর্বল করে। রবীন্দ্রনাথ 'কথা' কাব্যগ্রন্থ এবং 'শিখ স্বাধীনতা', 'বীর গুরু' ইত্যাদি প্রবন্ধে ভারতবর্ষের সঠিক ইতিহাস সামনে আনার চেষ্টা করেছেন কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষেও সেই রচনাগুলো শিক্ষার্থীদের সামনে আনা হয়নি।

ভারতবর্ষকে বুঝতে হলে, তাঁর নিজস্ব 'ভাষাই যে সর্বোৎকৃষ্ট তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন। নিজের উদাহরণ দিয়ে তিনি বারবার বোঝাতে চেয়েছেন বাল্যকালে মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণ একদিকে তার সাহিত্যসৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে আবার বিদেশি ভাষা আত্মস্থ করতেও তাঁর অসুবিধা হয়নি। পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত কোনো ইংরেজি সাহিত্য রচনা না করেও পরবর্তীতে কবিগুরু নিজে 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন আর তা বিশ্বমঞ্চে সর্বোচ্চ সম্মান, 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করেছিল।

আর ভারতবর্ষকে বুঝতে হলে সংস্কৃত ভাষার বিকল্প নেই তা রবীন্দ্রনাথ দ্ব্যর্থহীনভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, 'ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা জানতে পারি, সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে; তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিন্তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকে' (আশ্রমের রূপ ও বিকাশ)।

রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার যে যুগানুকূল প্রয়োগ বারবার উঠেছে আর সে প্রয়োগ তিনি বাস্তবায়িত করেছেন 'বিশ্বভারতী' বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। 'বিশ্বভারতী'কে তিনি ভারতের সঙ্গে বাকি বিশ্বের মিলনক্ষেত্র রূপে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন কিন্তু ভারতবর্ষের নিজস্ব 'জ্ঞান'-এর চর্চা বাদ দিয়ে নয় এবং সেই ব্যবহারিক জ্ঞান শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজে সরাসরি প্রয়োগ হবে আর এইভাবেই সমাজের সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যোগসাধন হবে। 'বিশ্বভারতী' প্রবন্ধে বিশ্বকবির এই ইচ্ছাই প্রকট হয়েছে--- 'ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠাস্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায়প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র, শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে। এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।'

ভারতবর্ষের মূল ভিত্তি যে সাংস্কৃতিক ঐক্য তার উপলব্ধি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বাধীনতার পর প্রায় ৭০ বছর ভারতীয় শিক্ষাকে তার সংস্কৃতি থেকে দূর করার চেষ্টা চলেছে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান-সহ বিভিন্ন বিষয়ে পাঠক্রম থেকে ভারতীয়ত্বকে দূর করা হয়েছে এবং ইউরোপীয় দৃষ্টিতে পড়ানো হয়েছে।

রবীন্দ্র জয়ন্তী প্রতিবছর পালিত হয় কিন্তু শিক্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তনের সঠিক চর্চা হয় না। বর্তমানে জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে ভারতবর্ষের শিক্ষা পদ্ধতিকে সঠিক দিশা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে কেন্দ্র-রাজ্য বিবাদের ঊর্ধ্বে উঠে ভারতীয়ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার সংস্কারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, আর তাহলেই ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে 'স্বতন্ত্র' হবে। □

অন্ধকার রাতের বুক চিরে ছুটে চলল সুভাষের গাড়ি

সুজিত রায়

শীতের কলকাতা। মধ্যরাত।

১৭ জানুয়ারি, ১৯৪১।

দেওয়াল ঘড়ির টিকটিক শব্দ জানিয়ে দিচ্ছে এখন সময় ১টা বেজে ২৫ মিনিট। দোতলার একটি প্রায়ান্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন লম্বা দাড়িওয়ালা, বিশাল জোব্বা পরিহিত মৌলবি জিয়াউদ্দিন খান। খানসাহেবের মাথায় একটি পেশোয়ারি বাহারি টুপি। একতলার গাড়ি বারান্দায় তখন অপেক্ষমাণ বিএলএ-৭১৬৯ নম্বরের ওয়ান্ডারা। প্রস্তুত ড্রাইভার স্টিয়ারিঙে। ঘন শীতের রাতে অপেক্ষমাণ পুলিশ কর্মীরা তখন নিদ্রামগ্ন। পঁচিশ জনের গোয়েন্দাবাহিনীও আড়ালে আবডালে একটু উষ্ণতার আশায়। ঘর্ঘর আওয়জ তুলে গাড়িটার চাকা গড়াল উলটোদিকে দক্ষিণ কলকাতার পথে। পিছনের সিটে বসা মৌলবি একঝলক গাড়ির পিছনের কাঁচ দিয়ে দেখে নিলেন ৩৮/২ এলগিন রোডের বাড়িটার দিকে যেখানে কয়েক মিনিট আগেই খোলসের মতো ছেড়ে এসেছেন মাতৃস্নেহ।

আর কখনও কি ফেরা হবে?

সামনে দুস্তর পথ। লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে সেই দুস্তর পাবাবার। কবে কীভাবে জানেন না মৌলবি ছদ্মবেশী সুভাষ। গান্ধীজীর স্নেহ থেকে বঞ্চিত, কংগ্রেস রাজনীতিতে লাঞ্ছিত, জওহরলাল নেহরুর 'চিরশত্রু' সুভাষচন্দ্র বোস। দেশে যাঁর পরিচয় নেতাজী। বিদেশে বোস। হ্যাঁ শুধুই বোস। অনেকের কাছেই বোস : দ্য থান্ডার কিংবা বোস : দ্য স্প্রিঙ্গিং টাইগার।

কোথায় চলেছেন মৌলবির বেশে?

আপাতত ধানবাদ। ধানবাদ-কাতরাস গড়ে ভাইপো ডাঃ অশোক কুমার বসুর বাংলোতে।

তারপর?

লক্ষ্য তো অনেক। পেশোয়ার। পেশোয়ার থেকে আফগানিস্তানের ভয়াল পাথুরে পথ পার হয়ে কাবুল। সেখান থেকে? জানা নেই। না, নেতাজীও জানেন না। হয়তো রাশিয়া, নয়তো জার্মানি। হতে পারে ইতালি। বলা যায় না, পথের শেষ হবে দূরপ্রাচ্য জাপান। তারপর?

এই লক্ষ্যটা স্থির। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লক্ষ্যভেদের প্রতিশ্রুতি। স্বাধীন ভারতবর্ষ। নেতাজী, হ্যাঁ, নেতাজীই একমাত্র বুঝেছিলেন, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে হলে ব্রিটিশ বিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মেলাতে হবে। যদি সেই শক্তি ফ্যাসিস্ট হয়, তাও। কারণ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পতাকাবাহী দেশীয় রাজনৈতিক শক্তি যে ভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার ভক্ত হয়ে উঠছে, তাতে ভারত ব্রিটিশ শক্তির কাছে স্বাধীনতা পেলেও তা হবে ভিক্ষের দান। কোনোদিনই তা অর্জিত স্বাধীনতা হিসেবে মর্যাদা পাবে না। আর সেই স্বাধীনতার অর্থ হবে স্বাধীন দেশের রক্ত, ঘাম নয়। তা হবে স্বাধীনতার অস্থি।

১৯৩৯ সালের ২৮ জুন।

হিটলারের জার্মানির কাছে ফ্রান্সের সমস্ত গর্বের খর্ব হলো। আর হিটলার সেই দিনেই সিদ্ধান্ত নিলেন--- এবার প্রয়োজন ব্রিটিশ শক্তিকে জোরালো আঘাত করার।

৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯। শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। একের পর এক দেশ দুর্দম গতিতে দখল করতে লাগল জার্মানি। পোল্যান্ড, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, নরওয়ে, তারপর ১৯৪০-এর ২৯ জুলাই এক গভীর রাতের অন্ধকারে বিষাক্ত

শ্বাপদের মতো নিঃশব্দে সামরিক যাত্রা শুরু করল তারা। লক্ষ্য ডানকান, ক্যালে, লে-হাভার শেরবুর্গ থেকে আধুনিক অস্ত্রসাজে সজ্জিত জার্মানির সমারিক বাহিনী পার হবে ইংলিশ চ্যানেল আর ডোভার প্রণালী। তারপর ধ্বংসের লেলিহান উন্মত্ততায় সমস্ত গর্ব খর্ব করে দেবেন ব্রিটিশ শক্তির। সঙ্গী হলো জার্মান বিমান বোমারু বাহিনীও। অর্থাৎ জলে- স্থলে-অন্তরীক্ষে সম্মিলিত আক্রমণ। প্রতিরোধের কথা ভাবার আগে বিস্ফারিত নেত্র ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল তখন আপন প্রাণের তাগিদে পিছু হঠা শুরু করেছেন। ইংল্যান্ডের উপকূল অঞ্চল দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছে ধ্বংসস্তূপে। কিন্তু হিটলারও যে মানুষ অন্তত একবারের জন্য হলেও সে প্রমাণ তিনি রাখলেন জার্মান সামরিক বাহিনীকে যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করতে বলে। ঠিক সেই মুহূর্তে যখন সেরবুর্গের নৌবাহিনী লিওঁ উপসাগর পার হয়ে উপকূলতটে পা ফেলতে এগোবে। আর ডানকান ও কালের বাহিনী ডোভার পার হয়ে ডাঙায় পা রাখতে চলেছে তখনই। কিছুদিনের জন্য হলেও বেঁচে গেলেন চার্চিল। কারণ একটাই--- গায়ের চামড়ার রং সাদা— হিটলারের মতোই।

কলকাতায় নেতাজী এই মোক্ষম সময়টিকেই বেছে নিয়েছিলেন তাঁর ব্রিটিশ বিরোধী পরিকল্পনাকে বাস্তবোচিতভাবে প্রয়োগ করার। কারণ সুভাষ জানতেন, শত্রুকে আঘাত হানতে হয় তার দুর্বল মুহূর্তে। কিন্তু কলকাতায় বসে থাকলে সে কাজ সম্ভব নয়। যে ভাবেই হোক— রাশিয়া অথবা জার্মানি পৌঁছতে হবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে হলে কংগ্রেস অথবা তার অহিংস আন্দোলন আর মহাত্মা গান্ধীর অহিংসাবাদের রাজনীতিকে পিছনে ফেলে এগোতে হবে বিদেশি শক্তির সাহায্য নিয়ে।

কাজটা কঠিন। কিন্তু তিনি তো শুধু দেশপ্রেমিক নন। মহাত্মা গান্ধীই তাঁকে বলতেন, 'প্যাট্রিয়ট অব দ্য প্যাট্রিয়টস।' তাতে জওহরলাল নেহরুর আঁতে ঘা লেগেছিল বটে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী তার পরেও বলতে ছাড়েননি— 'সুভাষচন্দ্র বসু ছাড়া তখনকার কংগ্রেস নেতাদের না ছিল চিন্তার ব্যাপ্তি, না ছিল চিন্তার কোনো গভীরতা...।'

এলগিন রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সুভাষের ওয়ান্ডরা রাতের অন্ধকারে ততোধিক অন্ধকার কালো পিচমোড়া আপার সার্কুলার রোড দিয়ে এগোচ্ছে হ্যারিসন রোডের দিকে। লক্ষ্য হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে ধরবেন গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড।

প্রস্তুতিটা চলছিলই। বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও চিন্তাবিদদের সঙ্গে আলোচনা সেরেছেন। ১৯৪০-এর আগস্টে শ্রদ্ধাস্পদ সোমনাথ লাহিড়ীর সঙ্গেও বিস্তারিত মত বিনিময় হয়েছে। পঞ্জাবের কৃষক প্রজা পার্টি সবরকমে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। জামশেদপুরের বড়ো ব্যবসায়ী বলদেব সিং এবং তাঁরই সূত্রে যোগাযোগ হলে টাটা কোম্পানির দুই পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার শৈলেশচরণ দাশগুপ্তর সঙ্গে। মাসিক অর্থসাহায্যের ব্যাপারে তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও আশীর্বাদ ও অর্থসাহায্যে কার্পণ্য করলেন না। পঞ্জাবের কিষান পার্টির অচ্ছর সিংহই নেতাজীকে দুই পথের সঙ্গীকে নির্বাচন করে দিলেন— ভগৎরাম তলোয়ার ও উত্তমচাঁদ। তাঁদেরই মতামত নিয়ে সুভাষচন্দ্রের জন্য ধর্মতলার ওয়াদেন মোল্লার দোকান থেকে গোপনে কেনা হলো শীতের কম্বল আর জামাকাপড়। এতটাই গোপনে যে বাড়ির চারপাশে প্রহরারত ১৫/২০ জন গোয়েন্দার চব্বিশ ঘণ্টার নজরদারিতেও যেন ধরা না পড়ে।

গঙ্গা পার হওয়ার পর জিটি রোডে পা রেখেই গতি বেড়ে গেল গাড়ির। চালকের আসনে সুভাষের প্রিয় ভাইপো শিশির কুমার বোস। সেই একই গতিতে সুভাষ পেরিয়ে যাচ্ছেন গভীর রাতের ততোধিক গভীর অন্ধকার ভেদ করে বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল। ঘড়িতে তখন ভোর ৫টা ৪০ মিনিট। ধানবাদ-কাতরাসগড়ের রাস্তার ওপর ডাঃ অশোককুমার বসুর সুদৃশ্য বাংলোর থেকে কিছুটা দূরে থামল ওয়ান্ডারা। প্রায় নিঃশব্দেই গাড়ি থেকে নামলেন দীর্ঘদেহী এলআইসি ইনস্পেক্টর মৌলবি সাহেব। হ্যাঁ, সুভাষের তখন ছদ্মবেশ সেই পরিচয়েই। সারাদিনটা কাটল ওখানেই। নানা আলোচনা। নানা পরিকল্পনা। ডাঃ বসু আর তাঁর স্ত্রী শোনেন আর চমকে ওঠেন। তাঁদের প্রিয় রাঙাকাকু এ কোন অনিশ্চিয়তার পথে পা রাখতে চলেছেন?

রাত ৮টা। গাড়ির চাকা গড়াল ফের। থামল এসে গোমো স্টেশনের সিগনাল পোস্টের কাছে। শিশির কুমার নেমে হেঁটে এগোলেন স্টেশনের দিকে। টিকিট কাউন্টারে। তিনি টিকিট কেটে অপেক্ষা করছিলেন প্লাটফর্মে। ওয়ান আপ কালকা মেল প্লাটফর্মে ঢোকার পূর্বমুহূর্তে ছদ্মবেশী সুভাষ গাড়ি থেকে নেমে উঠলেন প্লাটফর্মে। শিশিরবাবুর কাছ থেকে টিকিট নিয়ে নিঃশব্দে উঠে বসে পড়লেন জানালার ধারে একটি সিটে। ট্রেন ছাড়ল। লক্ষ্য পেশোয়ার। গোমো থেকে দিল্লি। মৌলবির ছদ্মবেশে সুভাষ একাকী। ১৮ জানুয়ারি দিল্লি পৌঁছল কালকা মেল। এবার সওয়ার হবেন নতুন ট্রেন ফ্রন্টিয়ার মেলে। পেশোয়ায় পৌঁছালেন। পরদিন ১৯ জানুয়ারি। প্লাটফর্মে পা রাখলেন যখন সন্ধ্যা নেমেছে।

এক রহস্যময় অভিযাত্রীর বেশে সুভাষ চলেছেন এক বিপজ্জনক পথের সঙ্গী হতে অন্ধকারের রাত কাটিয়ে নতুন ভোরের উজ্জ্বল সকালকে ছিনিয়ে আনতে। □

শ্রীচৈতন্য না থাকলে বাঙ্গলা বাঁচত না

ড. জিষ্ণু বসু

'প্রেমের পূর্ণিমার চাঁদ, তুই ফিরে আয়/তুই ফিরে আয়/ফিরে আয়, অন্ধকার নদীয়ায়'— গত পাঁচ শত বছর বাঙ্গালি এই গান গেয়েছে। দুই বাঙ্গলায় কয়েক হাজার গান বাঁধা হয়েছে। কয়েক শত নাটক, যাত্রা তৈরি হয়েছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ নিয়ে।

বাঙ্গলার ঘরে শৈশব থেকে যখন কৈশোর আসে, তখন যেমন 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান/শিবঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যা দান' শোনে, ঠিক তেমনই শুনতে পায়, 'বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদে রে/ কাঁদে শচীমাতা', বেড়ে ওঠার ওই সময়ে কিশোর ভাবতে থাকে এই রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শে ভরা সুন্দর পৃথিবীতে যখন তিন তিনজন সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে সুখে ঘরকন্না করার সুযোগ আছে এবং জীবনের প্রবাহই গার্হস্থ্য-সংসারধর্ম তবু কেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাঁদিয়ে মানুষ ত্যাগের পথে যায়? ত্যাগের পথে যাওয়া কি নিজের মুক্তির জন্য দরকার? নাকি জগতের জীবের উদ্ধারের জন্য? অথবা কেবলমাত্র সংসারের দায়িত্ব থেকে পালিয়ে যাওয়া? হিন্দু বাঙ্গালি একান্নবর্তী পরিবারে পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে এক ভাই অনেক সময়ই বিয়ে করে না, সংসারের কাজ করে, সমাজের কাজ করে। এই নিঃস্বার্থ ত্যাগের মানসিকতাও কি গৌরাঙ্গের গৃহত্যাগের প্রভাবে! কোনো না কোনো ভাবে কি বাঙ্গালির শতশত বছরের 'রোল মডেল' নদের নিমাইয়ের সন্ন্যাস বাঙ্গলার লোকজীবনে এক গভীর রেখাপাত করেছিল?

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সারা ভারতবর্ষ ঘুরছেন তখন কাশ্মীর থেকে বাঙ্গলায় চলছে এক অত্যাচার। আরব আক্রমণকারী রাজশক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সুফি প্রচারকদের অত্যাচার। চতুর্দশ শতকে তুরস্ক থেকে আসা সুফি হজরত বুলবুল শাহ কাশ্মীরে সুফি মতবাদ আনেন। যার ফল কাশ্মীরবাসী ভোগ করেন। ১৩৮৯ সালে মসনদে বসেন শাহ মির সাম্রাজ্যের সিকান্দর শাহ মির। সিকান্দর কাশ্মীরের হাজার বছরের হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি নিষ্ঠুর নির্যাতনের মাধ্যমে শেষ করেন। তার দরবারে প্রতিদিন কয়েকশো হিন্দুর ধর্ম পরিবর্তন হতো আর হাজার হাজার নিরীহ মানুষের প্রাণ যেত। সিকান্দর সূর্যদেবের মার্তণ্ড মন্দির, ভগবান শিবের বিজয়শূর

মন্দির, পরমেশ্বর বিষ্ণুর চক্রধর মন্দির, সুরেশ্বরী মন্দির, মহাশ্রী মন্দির, পরিহাসপুরের তারাপীঠ ধ্বংস করে। ঠিক তেমনই আফ্রিকার ইয়েমেন থেকে বাঙ্গলায় এসেছিল সুফি দরবেশ শাহ জালাল। তার বিশ্বাসঘাতকতায় ১৩০৩ সালে সিকান্দার খান গাজি সিলেটে মহাপ্রতাপশালী রাজা গৌর গোবিন্দকে অন্যায় যুদ্ধে হারিয়ে দেয়। তারপর থেকেই শ্রীহট্টে সুফি অত্যাচার শুরু হয়। সারা ভারতের অন্যতম প্রাচীন সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শ্রীহট্টে। একটু একটু করে ধ্বংস হতে থাকে হাজার বছরের সাধনার ধন। শ্রীচৈতন্যের পিতৃদেব জগন্নাথ মিশ্রের শ্রীহট্ট ছেড়ে নবদ্বীপে চলে আসার পেছনে অবশ্যই এই অসহনীয় অত্যাচার অন্যতম কারণ ছিল। নিমাইয়ের জন্ম হয়েছিল শচীমাতার পিত্রালয় সিলেটের ঢাকা দক্ষিণে। নিমাই সন্ন্যাসের নেপথ্যে এই কয়েকশো বছরের সুফি দরবেশদের অত্যাচারের কাহিনি বোঝা প্রয়োজন।

কাশ্মীরে সেদিন এক গণআন্দোলনের প্রয়োজন ছিল। কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নন সমগ্র সমাজকে প্রতিরোধে যুক্ত করার উপায় উদ্ভাবনের দরকার ছিল। কাশ্মীর দেবদুর্লভ ঋষিদের তপোভূমি কিন্তু কাশ্মীর সেদিন কালের আহ্বান বুঝতে পারেনি। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে যখন কেশব মিশ্র কাশ্মীর থেকে নবদ্বীপে শাস্ত্রচর্চা করে পণ্ডিতদের হারাতে এলেন, তখনও কাশ্মীর বোঝেনি যে, সেদিন গণআন্দোলনের প্রয়োজন ছিল। আচণ্ডালে হরিনাম বিতরণের দরকার ছিল, নগরসংকীর্তনে অত্যাচারীর হৃদয় কাঁপানো প্রয়োজন ছিল আর যেটা একান্ত জরুরি ছিল একজল সাহসী যুবক— যাঁরা সংসার ত্যাগী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। যাঁরা 'শ্রী শিক্ষাষ্টকম'র সামান্য সরল বাণীকে বুকে নিয়ে সমাজকে নেতৃত্ব দেবে।

বরকোনাঘাটায় নিমাই পণ্ডিত ভারত বিখ্যাত কেশব কাশ্মীরিকে তর্কে পরাজিত করেছিলেন। এই প্রসিদ্ধিই তাঁকে সারাজীবন দুধেভাতে রাখতে পারত। রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলা বিদ্যাপীঠের পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র ছিলেন। রঘুনাথ শিরেমণি নবদ্বীপে ফিরে নব্যন্যায়ের মহাবিদ্যালয় স্থাপন করলেন। পণ্ডিত বিশ্বম্ভর মিশ্র মানে নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপে এই নব্যন্যায়ের উত্থানের সময়ও ব্যাকরণের অধ্যয়ন করলেন। শোনা যায় গঙ্গাবক্ষে রঘুনাথ শিরোমণি নিমাই পণ্ডিতের ন্যায়ের উপরে টীকা শুনে আপ্লুত হয়েছিলেন। বলেছিলেন এই শ্লোক পড়লে বিদ্বজ্জনেরা আর গঙ্গেশ উপধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণির উপর রঘুনাথের ভাষ্য তত্ত্বচিন্তামণি দিধিতি পাঠ করবে না। নিমাই পণ্ডিত তাঁর লেখা শ্লোক নাকি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁর মনের গভীরে কি সেদিনও ছিল সমাজকে রক্ষার কোনও অভিনব উপায় আবিষ্কারের ইচ্ছা? সুফি অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনো সঠিক কার্যকরী পন্থা বের করতে চেয়েছিলেন কি তিনি?

মাত্র ১৫ বছরেই নিমাইয়ের বিয়ে হয়েছিল পণ্ডিত বল্লভাচার্যের অপরূপা সুন্দরী কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে। সেই সময়ই স্মার্ত পণ্ডিতেরা বা নৈয়ায়িকেরা নিমাইকে সম্ভ্রম করা শুরু করেছেন। নতুন বিয়ের পরে কিশোর নিমাই ভাগ্যান্বেষণে পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মীপ্রিয়া সেখানে সর্পাঘাতে মারা গেলেন। ভগ্নমনোরথ নিমাই নবদ্বীপে ফিরলেন।

মায়ের কথায় নিমাই আবার বিবাহ করলেন। রাজা পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াকে। অপূর্ব সুন্দরী সর্বগুণসম্পন্না নারী বিষ্ণুপ্রিয়া। 'পত্নীং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানু সারিণাম্। তারিণীং দুর্গসংসার সাসরস্য কুলোদ ভবাম্।।' দুর্গাস্তুতির প্রার্থনার পার্থিবরূপ যেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

এটা ভাবলে হয়তো ঠিক হবে না, যে নিমাই পণ্ডিতের মতো ব্যক্তিত্ব কারোর উপরোধে বা মায়ের স্নেহসিক্ত অবদারে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন। নিমাই তখনও হয়তো পথ পাননি। বুঝেছিলেন কেবল পাণ্ডিত্যে হবে না, ন্যায়ে হবে না, জাগাতে হবে সম্পূর্ণ সমাজের মানুষকে। কিন্তু সন্ন্যাস যে নিতেই হবে তখনও হয়তো ভাবেননি।

১৭ বছর বয়সে গয়ায় গিয়ে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনে সেই পথ মিলল। পেয়ে গেলেন ভারতবিখ্যাত মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীকে। নদীয়ার নবদ্বীপে ফিরলেন এক নতুন মানুষ হয়ে। বৈষ্ণব ভাব-আন্দোলনের শুরু হলো নবদ্বীপে। অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস আর অন্যান্য বৈষ্ণবদের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রজ্বলিত হলেন যুগাবতার ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। সন্ন্যাসগ্রহণ হয়ে উঠল অনিবার্য।

ঠিক একই সময়ে বৈষ্ণব ভাব-আন্দোলনের মাধ্যমে আসলে ধর্ম-সংস্কৃতিরক্ষার গণ-আন্দোলন গড়ে উঠছে রাজস্থানের মাড়োয়ারে,গুজরাটে। পঞ্চদশ শতকের শুরুতে ১৪১৪ সালে নরসিংহ মেহতা, ১৪৮৬ সালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আর ১৪৯৮ সালে সাধিকা মীরাবাঈ। মীরার স্বামী ভোজরাজ দিল্লির সুলতানের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে ১৫১৮ সালে আহত হয়ে ফিরলেন। সেই আঘাতের ফলে ১৫২১ সালে মৃত্যু হলো। মীরার বাবা ও শ্বশুরমশাই দুজনই মুঘল সম্রাট বাবরের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ হারান।

তাই সমাজের বিপদ বুঝে তিনজন সমাজ উদ্ধারকই নিজেদের জীবনকে সংসার থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। নরসিংহ মেহতা বনে চলে গিয়েছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিয়েছিলেন সন্ন্যাস। নরসিংহ মেহতা গাইলেন, 'বৈষ্ণব জন তো তেন কহিয়ে জে পীড় পরায়ী জানে রে।' সে-ই বৈষ্ণব, যে পরকে ভালোবাসতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, 'অমানিনা মান দেন, কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।' মানহীনকে সম্মান দাও আর সর্বদা হরির নাম করো। মানুষ বাঁচলে, সমাজ ঐক্যবদ্ধ থাকলে, ধর্ম আর সংস্কৃতি রক্ষা পেলে তবেই শাস্ত্র বাঁচবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হবে। নতুবা সর্বত্রই আফগানিস্তান বা কাশ্মীরের মতো অবস্থা হবে। পঞ্চদশ শতকে নরসিংহ মেহতা, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আর মীরা বাঈয়ের ত্যাগের ফলেই সমাজে গণ-আন্দোলন সম্ভব হয়েছিল। বেঁচে গিয়েছিল গুজরাট, রাজস্থান আর বাংলাদেশ। □

মিসিং লিংক

রামায়ণের বানরেরা ছিল ছদ্মবেশী ক্ষত্রিয়

সন্দীপ চক্রবর্তী

নৃতত্ত্বের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে হোমো স্যাপিয়েন্স, হোমো ইরেকটাস এবং নিয়ানডারথালস খুবই পরিচিত শব্দ। কিন্তু যারা তা নন, তাদের জন্য বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আধুনিক মানুষকে বিজ্ঞানের ভাষায় হোমো স্যাপিয়েন্স বলা হয়। হোমো ইরেকটাস ছিল সভ্য মানুষের নিকটতম পূর্বপুরুষ। অন্যদিকে, ৪ লক্ষ ৫০ হাজার থেকে ৪০ হাজার বছর আগে পর্যন্ত নিয়ানডারথাল গোষ্ঠীর মানুষ পৃথিবীতে ছিল। বোঝাই যাচ্ছে নিয়ানডারথাল প্রজাতির মানুষের বিবর্তনের ধারা ছিল বেশ দীর্ঘ। অর্থাৎ নিয়ানডারথালরা পৃথিবীতে থাকতে থাকতেই হোমো ইরেকটাস এবং হোমো স্যাপিয়েন্সের উদ্ভব হয়ে গিয়েছিল। প্রশ্ন হলো, ভারতে কি এই তিন ভিন্ন প্রজাতির মানুষ কোনও সময় একসঙ্গে ছিল?

সম্প্রতি রামায়ণ-গবেষক ও ঐতিহাসিক ড. রঞ্জন রামাকৃষ্ণন তাঁর 'দ্য রামায়না অব বাল্মীকি' গ্রন্থে পরিষ্কার বলেছেন, রামায়ণের বানরেরা ছিল একটি বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ। তাদের বাঁদর ভাবার কোনও অবকাশ নেই। ড. রামাকৃষ্ণানের কথায়, 'আঞ্চলিক ভাষায় লেখা রামায়ণের প্রভাব কাটিয়ে কেউ যদি বাল্মীকির মূল রামায়ণ খুঁটিয়ে পড়ে তা হলে বুঝতে পারবে বানর বা হনুমান ছিল মানুষ। তারা কথা বলতে পারত। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল। বাল্মীকির রামায়ণে বানরদের লেজ ছিল এবং তাদের মুখের গঠন ছিল প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মতো। এর ফলেই হয়তো আজকের মানুষ তাদের বাঁদর ভেবে বসেছে। কিন্তু ব্যাপারটা আদপেই সেরকম নয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে বানর ও হনুমান ছিলেন একটি ভিন্ন প্রজাতির মানুষ।'

প্রসঙ্গত হোমো ইরেকটাস শ্রেণীভুক্ত মানুষ নিয়ে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। ইন্দোনেশিয়ার জাভায় ১ লক্ষ ১৭ হাজার বছরের পুরনো যে ফসিল পাওয়া গেছে সেটি পৃথিবীতে হোমো ইরেকটাস শ্রেণীর সর্বশেষ প্রজন্মের। পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হবার আগে হোমো ইরেকটাস শ্রেণীর মানুষ নানা ভিন্ন প্রজাতির মানুষের সংস্পর্শে এসেছিল। কিন্তু হোমো ইরেকটাসের সঙ্গে বানর বা হনুমানের সম্পর্ক কী? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ড. রামাকৃষ্ণান লিখেছেন, 'রামায়ণ সম্ভবত একমাত্র রচনা যা আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষের বিবর্তনের ধারায় যেসব ফাঁকফোকর আছে তার ওপর আলোকপাত করতে পেরেছিল। শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কথা ধরলে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতা হোমো স্যাপিয়েন্স গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বানর ও হনুমানের সঙ্গে হোমো ইরেকটাসদের অনেক মিল পাওয়া যাবে। আবার রাবণ-সহ রাক্ষসেরা ছিল নিয়ানডারথাল শ্রেণীভুক্ত। এখন প্রশ্ন, বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে রামায়ণের প্রধান চরিত্রদের এই মিল কি সম্পূর্ণ কাকতালীয়? নাকি, বাল্মীকি বলতে চেয়েছেন তিনটি ভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মানুষ সেইসময় ভারতে ছিল এবং রাম-রাবণের যুদ্ধ ছিল প্রবল নিয়ানডারথালদের সঙ্গে হোমো স্যাপিয়েন্স ও হোমো ইরেকটাসের সম্মিলিত অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম?

ছোটো পরিসরে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা বরং ফিরে যাই বানর ও হনুমানের প্রসঙ্গে। মুণ্ডা বা মুণ্ডারি ভাষায় কথা বলা জনজাতিদের মধ্যে ওরাওঁ-রা অগ্রগণ্য। ওরাওঁদের দাবি তারা রামায়ণের বানরদের বংশধর। আবার, মুণ্ডা বা মুণ্ডারি ভাষাগোষ্ঠীর আরেক জনজাতি ভুইয়ারা মনে করে তারা হনুমানের বংশধর। এই ধরনের দাবিকে খুব সহজেই অবৈজ্ঞানিক বা অনৈতিহাসিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে প্রয়োজন বিশ্বাসযোগ্য তথ্যপ্রমাণের। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে একটি প্রস্তরলিপির কথা। এই লেখ অনুযায়ী, বানররাজ বালী এবং তাঁর বংশধরেরা ছিলেন ক্ষত্রিয়। পরশুরামের ভয়ে তারা আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধন বন্ধ হলে তারা আত্মপ্রকাশ করেন। এই শিলালেখ উৎকীর্ণ

করেছিলেন সম্রাট বিক্রমাদিত্য (১১১২ এ.ডি.)। তাঁর করদ রাজা দাদিগার (রাজা গোণ্ডার পুত্র) বংশপরিচয় সন্ধান করাই ছিল বিক্রমাদিত্যের উদ্দেশ্য। দাদিগা ছিলেন বালী জাতির মানুষ। এই বালী জাতির উদ্ভব হয়েছিল বানররাজ বালী থেকে। এসব তথ্য বিক্রমাদিত্যের শিলালেখ থেকে পাওয়া গেছে।

শিলালেখতে বালী জাতিকে বাপুরা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই 'বাপুরা' শব্দটি সম্ভবত বালীপুরা শব্দের অপভ্রংশ। এই বালীপুরারই সম্রাট ছিলেন বালী। এখন বালীগেভ নামে পরিচিত জায়গাটি সম্ভবত বালীগুহার রূপান্তর। রামায়ণে আছে রামের সঙ্গে সুগ্রীবের দেখা হয়েছিল গুহায়। অনেকে মনে করেন পরশুরামের ভয়ে বানরেরা যখন আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন তখন তারা এইসব গুহায় থাকতেন। এমনই এক গুহায় বালীকে সুগ্রীব বন্দি করে রেখেছিলেন যখন তিনি এক মায়াবীর সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। দ্বাদশ শতকের অন্য এক শিলালেখ থেকে জানা যাচ্ছে, এই গুহায় পাণ্ডবেরা এসেছিলেন। তারা এখানে পাঁচটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এই অঞ্চল বেলাগবি নামে পরিচিত। কর্ণাটকের শিমোগা জেলার শিকারিপুর তালুকের অন্তর্গত এই বেলাগবি।

কেউ কেউ বলেন, দাদিগার সঠিক উচ্চারণ দিদিগা। পঞ্চম শতকে রাজা কোঙ্গনী ভার্মা বা কোঙ্কনী ভার্মা দিদিগা নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়। রামায়ণের যুগ আর পঞ্চম শতকের মধ্যে ব্যবধান অনেকটাই। আপত্তির এটা একটা বড়ো কারণ। এই প্রসঙ্গে একটা অন্য ক্লু নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। দাদিগা শব্দটির সঙ্গে দধিমুখের ধ্বনিগত মিল রয়েছে। দধিমুখ ছিলেন বালী ও সুগ্রীবের মামা। ধ্বনিগত মিলটি এরকম দাদিগা > দাধিগা > দধিমুখা। দধির সঙ্গে দুগ্ধজাত সামগ্রীর সম্পর্ক আছে। দধিমুখ ছিলেন বালী ও সুগ্রীবের মধুবন নামক উদ্যানের রক্ষক।

এই উদ্যান-সংস্কৃতির সঙ্গে মুণ্ডা ভাষাভাষী বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের সম্পর্ক এখনও অতি নিবিড়। বানরদেরও এটা ছিল। রামায়ণে মধুবনের উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে, এই উদ্যান ছিল খুবই পবিত্র এবং বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য উদ্যান রচনা করা হয়েছিল। কী সেই উদ্দেশ্য? বাল্মীকি লিখেছেন, কিষ্কিন্ধার মধুবনে বিশেষ শ্রেণীর গাছপালা লাগানো হতো মূলত মৌমাছি পালন ও মধুসংগ্রহের জন্য। দধিমুখের একটি সংলাপ থেকে জানা যাচ্ছে বালী ও সুগ্রীবের পিতামহ ছিলেন মধুবনের স্রষ্টা। পরে তাঁর পুত্র ঋক্ষরাজা মধুবনের দায়িত্ব নেন।

বালী ও সুগ্রীবের পিতার নাম ঋক্ষরাজা— এই ব্যাপারটা এখানে একটু সংশয় তৈরি করে। সে যুগে মানুষের শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক বিশেষত্বের কথা মাথায় রেখে তার নামকরণ হতো। সংশয় সেই কারণেই। ঋক্ষ মানে ভালুক। যদি ধরেও নিই যে বানর মানে বাঁদরই, তাহলেই-বা বানরের বাবার নাম ভালুকরাজ হয় কী করে? রামায়ণে একটি জনপ্রিয় ভালুক চরিত্র পাওয়া যায়, যার নাম জাম্ববান। জাম্ববান ও বানরেরা ছিল পরস্পরের বন্ধু। রামায়ণের অনেক জায়গায় জাম্বমানকে কপিশ্রেষ্ঠ বা বানরশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। আধুনিক ধারণা অনুযায়ী, যেহেতু বাঁদর আর ভালুক দুটি ভিন্ন প্রজাতি, তাহলে রামায়ণের যুগে এরা এক হয়ে যায় কী করে?

এবার দ্বিতীয় ক্লু। রামায়ণ থেকে জানতে পারছি, পরশুরামের ভয়ে পুরুবংশের বিদুরথ ঋক্ষবনে আশ্রয় নেন। তার দেখাশোনা করত ভালুকেরা। সেই সময় পরশুরামের ভয়ে বহু ক্ষত্রিয় বনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আশ্রয়ই নয় এদের মধ্যে অনেকেই ছদ্মবেশ ধারণ করে এখানে থাকতেন। সেই ছদ্মবেশ ছিল বানর ও ভালুকের। পুরুবংশের রাজাও এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর দেখাশোনা করেছিলেন ঋক্ষরা।

জাম্ববান কখনই সাধারণ ভালুক ছিলেন না। তাঁর আচার-আচরণ ছিল মানুষের মতো। কৃষ্ণের স্ত্রী জাম্ববতী ছিলেন জাম্ববানের কন্যা। যদিও তাঁর শারীরিক গঠনে ভালুকের কোনও চিহ্ন ছিল না। ঋক্ষ ও বানরেরা ঋক্ষবন ও কিষ্কিন্ধ্যায় থাকতেন। সব থেকে বড়ো কথা, এরা প্রায়শই নিজেদের শারীরিক বিশেষত্ব পালটে ফেলতেন। অর্থাৎ বানর থেকে ভালুক বা ভালুক থেকে বানর হয়ে যেতেন। যদি কোনও মানুষ বিশেষ প্রয়োজনে বানর বা ভালুকের ছদ্মবেশ ধারণ করেন তখনই এটা সম্ভব। সুতরাং ছদ্মবেশের তত্ত্বটি এখানে বিশেষ প্রণিধ্যানযোগ্য।

বালীর পিতামহ সম্ভবত সেই প্রজন্মের ক্ষত্রিয়, যারা প্রথম পরশুরামের হাত থেকে বাঁচার জন্য কিষ্কিন্ধ্যায় বানরের ছদ্মবেশে আশ্রয় নেন। এর অনেক পরে বালী সম্ভবত সেই প্রজন্মের মানুষ যারা অরণ্য থেকে বা গুহা থেকে বেরিয়ে বাইরে আসেন। গুহা থেকে বেরিয়ে হিংস্র পশুদের এড়িয়ে অরণ্যে ঘোরাফেরা করার সহজতম উপায় হলো গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে এগিয়ে যাওয়া। অনেকটা টারজানের মতো। এর জন্য একটা কৃত্রিম লেজ লাগিয়ে নিলে আরও সুবিধা। বালী সম্ভবত তাই করেছিলেন। কারণ বালী কথাটি তামিল 'ভাল' শব্দের সঙ্গে মিলে যায়। সংস্কৃতে 'বালীন' শব্দের অর্থ হলো কেশ বিশিষ্ট বা লেজ বিশিষ্ট। কৃত্রিম লেজ রাখার সুবিধাটি বুঝে ফেলার পর বালীর সঙ্গীরাও লেজ রাখতে শুরু করে। কৃত্রিম লেজের যথাযথ ব্যবহার করেছেন হনুমানও। তিনি লেজটাকে ইচ্ছেমতো বাড়াতে বা কমাতে পারতেন। রাবণ তার লেজে আগুন লাগিয়ে দিলেও হনুমানের কোনও অসুবিধে হয়নি। লেজটি তার শরীরের স্বাভাবিক অঙ্গ হলে কি এটা সম্ভব হতো?

সুতরাং বানর ও ঋক্ষরা যে ছদ্মবেশী ক্ষত্রিয়— একথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। বাল্মীকি বালীর স্ত্রী তারাকে আর্যরমণী বলেছেন। আবার তারা বালীকে সম্বোধন করেছেন আর্যপুত্র বলে। সাধারণ বাঁদর বা ভালুককে আর্য বলার রীতি তখন ছিল না। তাহলে শেষে এটাই দাঁড়াল যে রাবণ রামের ক্ষত্রিয়বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, বানরসেনার কাছে নয়। তবে রাবণ ছাইচাপা আগুন চিনতে ভুল করেছিলেন। সম্ভবত তিনি ভেবেছিলেন ক্ষত্রিয়রা ধ্বংস হয়ে গেছে এই অবস্থায় অযোধ্যার নির্বাসিত রাজার পোষা বাঁদর ভালুকগুলোকে তিনি একদিনেই শেষ করে দেবেন। □

ইলা মিত্র

গত ১৩.১২.২০২১-এ স্বস্তিকা পত্রিকায় মণীন্দ্রনাথ সাহা লিখেছেন, ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য ইলা মিত্রকে ১৯৫৪ সালে ঢাকা জেল থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর তিনি কলকাতায় চলে আসেন। (বিশেষ নিবন্ধ; স্বস্তিকা, ১৩.১২.২১)। শ্রী সাহার কথা থেকে মনে হবে, লিগ সরকার স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ইলা মিত্রকে ছেড়ে দিয়েছিল। ঘটনা হলো, ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফজলুল হক পূর্বপাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট নেতাদের অনুরোধে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ইলা মিত্রের প্যারোলে মুক্তির জন্য হক সাহেবকে অনুরোধ করেছিলেন। হক সাহেব ওই অনুরোধ রেখেছিলেন। তিনি ইলা মিত্রকে বিমানে কলকাতা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেশভাগের পর ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে কলকাতায় সিপিআই-এর পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পূর্ব পাকিস্তানে পার্টি সংগঠনের জন্য বর্ধমান জেলার কমিউনিস্ট নেতা সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাকে পাঠানো হয়েছিল। তিনি রাজশাহীতে ইলা মিত্রের সঙ্গে আন্দোলন করতে গিয়ে ধরা পড়েন। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় রাজশাহী জেলে তাঁর ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চলেছিল; রাজশাহীর হাসপাতালে তিনি তিনদিন অজ্ঞান ছিলেন। পরে ওখানে তাঁর যেসব আত্মীয় অফিসার ছিলেন, তাঁরা তাঁকে ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁদেরই উদ্যোগে চিকিৎসার জন্য তিনি জামিন পেয়েছিলেন; এবং তাঁরাই তাঁকে স্টিমারে চড়িয়ে গোয়ালন্দে পৌঁছে শিয়ালদার ট্রেনে উঠিয়ে দিয়েছিলেন।

একই উদ্দেশ্যে, উপরোক্ত পার্টি কংগ্রেসে পশ্চিম পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক প্রধান হিসেবে এলাহাবাদের কমিউনিস্ট নেতা সাজ্জাদ জাহিরকে মনোনীত করা হয়েছিল। ১৯৫৯ সালে সংসদে কমিউনিস্ট সদস্য রেণু চক্রবর্তী একদিন বক্তৃতার সময় হঠাৎ বলে ফেলেন, ভারতে গণতন্ত্র বলতে কিছু নেই, এমনকী 'পাকিস্তানের চেয়েও খারাপ...।' রেণু চক্রবর্তীর মন্তব্য কানে যেতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে কংগ্রেস সাংসদ ফিরোজ গান্ধী শ্লেষের সঙ্গে রেণু চক্রবর্তীকে প্রশ্ন করেছিলেন, সাজ্জাদ জাহিরও কি ওই কথা বলবে? সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকের ভাষায়, 'ছোবল মারতে উদ্যত সর্পিণী যেমন হঠাৎ ফণা নামিয়ে আঘাতের আশঙ্কায় দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায়' ঠিক তেমনি ভাবে রেণু চক্রবর্তী সভাকক্ষ ছেড়ে তড়িৎ গতিতে চলে গেলেন। খবরকাগজের রিপোর্টারদের চোখে কিন্তু ওই দৃশ্য ধরা পড়েছিল। সংসদের লবিতে তাঁরা ফিরোজ গান্ধীকে ঘিরে ধরে জানতে চাইলেন, কে সাজ্জাদ জাহির, কেন কমিউনিস্টরা তাঁর প্রশ্নে বিব্রত হয়ে পড়লেন? ফিরোজ গান্ধী রিপোর্টারদের কাছে যে রহস্যের উদ্‌ঘাটন করেছিলেন, তাহলো— সাজ্জাদ জাহির ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে 'রাওয়ালপিণ্ডি ষড়যন্ত্র' মামলায় ধরা পড়েছিলেন। পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলে তিনি অমানুষিক অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার শিকার হন। অত্যাচারের ফলে তাঁর দেহে বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ ঘটে এবং তিনি মৃতপ্রায় হয়ে পড়েন। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ ভারতে সরকারি সফরে এসেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে গোলাম মহম্মদ ছিলেন জওহরলাল নেহরুর অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওই সময় কমিউনিস্ট সাংসদদের প্রতিনিধিদল নেহরুর সঙ্গে দেখা করেন এবং সাজ্জাদ জাহিরকে চিকিৎসার জন্য যাতে পাকিস্তান 'প্যারোলে' মুক্তি দেয়, সেজন্য গোলাম মহম্মদকে অনুরোধ করতে নেহরুর কাছে আবেদন রাখেন। জওহরলাল একেবারেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাজ্জাদ জাহিরের প্রসঙ্গ গোলাম মহম্মদের কাছে উত্থাপন করেন। ভারত সফর শেষে করাচি ফিরেই গোলাম মহম্মদ সাজ্জাদ জাহিরকে চিকিৎসার জন্য প্যারোলে মুক্তির নির্দেশ দেন এবং তাঁকে ভারতে আসার জন্য একটি পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দিতে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রদপ্তরকে বলেন। এই বিষয়টি গোলাম মহম্মদ জওহরলাল নেহরুকে জানিয়ে দেন। এর পর সাজ্জাদ জাহির লাহোর থেকে দিল্লি আসেন। দিল্লিতে দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর তিনি গোপনে ভারত সরকারের কাছে 'রাজনৈতিক আশ্রয়' প্রার্থনা করেন। ভারত সরকার গোপনেই তাঁকে 'রাজনৈতিক আশ্রয়' দেন।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার হালচাল

আজ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে নোংরা রাজনীতি প্রবেশ করেছে। তাই স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্রই কিছু পেটোয়া লোক দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষকদের বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর, জাতির মেরুদণ্ড। সেই জাতির মেরুদণ্ড আজ লাগাম ছাড়া দুর্নীতির শিকার হয়ে রাজপথে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। আগাগোড়া দুর্নীতির মাধ্যমে অযোগ্য ব্যক্তিদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ হচ্ছে। সেই সব শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের কি শিক্ষা দেবে? অধিকাংশ স্কুলে পড়াশোনার মান তলানিতে ঠেকেছে। সম্প্রতি করোনার অজুহাতে পরীক্ষা না দিয়ে যেসব ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিকে ঝুড়ি ঝুড়ি নাম্বার পেল তাদের অনেকেই নাম, ঠিকানা পর্যন্ত লিখতে জানে না। আসলে শিক্ষার মাধ্যমে মানসিক শারীরিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রদের মেধার কোনো বিকাশ ঘটছে না। ভবিষ্যতে মানবসম্পদের যথেষ্ট ঘাটতি হবে। এমনকী সর্বভারতীয় ডাক্তারি পরীক্ষায় বাঙ্গলার ছেলে-মেয়ে খুব কম সুযোগ পাচ্ছে। এমনিতেই বাঙ্গলায় কোনো চাকরি নেই, তার ওপর শিক্ষাটা এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই সমস্ত অর্ধশিক্ষিত, দুর্বল মস্তিষ্কের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের চাকরি পাওয়ার যোগ্য মনে করবে না। ফলে দিদির ঝান্ডার তলায় আশ্রয় নিয়ে নিজেদের বেকারত্ব দূর করবেন। অতি সুকৌশলে বাঙ্গলার শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে একপ্রকার ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শুধু সাইকেল, কন্যাশ্রী, রুপশ্রী দিয়ে শিক্ষার প্রসার হয় না। শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে উপযুক্ত পরিকাঠামো ও পরিকল্পনা দরকার।

—**চিত্তরঞ্জন মান্না,**
গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর।

ফঃ ৩

ভারতের বিভিন্ন স্থান, স্থাপত্য ও সংস্থার পূর্বের নাম ফিরিয়ে আনা হোক

ধীরেন দেবনাথ

শেক্সপিয়ার লিখেছিলেন, 'নামে কী আসে যায়!' তবে একথাও সত্যি, নামেও অনেকক্ষেত্রে অনেক কিছু আসে যায়। যেমন— রামের নাম রহিম, ঈশ্বরপুরের নাম ইসলামপুর বা জন্মাষ্টমী যদি খ্রিস্টাষ্টমী রূপে পালিত হয় তাহলে অনেকেরই অনেক যায় আসে। আমার বক্তব্যের বিষয় হচ্ছে, আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানের নাম পরিবর্তন যা বিদেশি-বিধর্মী সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এক কুকর্ম।

খবরে প্রকাশ, দক্ষিণ দিল্লি পুরনিগমের অধীন মহম্মদপুর গ্রামের নাম স্থানীয় কাউন্সিলর পরিবর্তন করে নামকরণ করেছেন মাধবপুরম। এছাড়াও আরও ৪০টি গ্রামের নাম বদলের পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে একটি চিঠি লিখে দিল্লি বিজেপির সভাপতি আদেশ গুপ্তা জানিয়েছেন, এলাকাগুলিকে দাসত্বের প্রতীক থেকে মুক্ত করে বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং দেশের মহাপুরুষ বা কৃতী মানুষ, যেমন গুরু গোবিন্দ সিংহ, বাল্মীকি, রবিদাস, লক্ষ্মীবাই, মঙ্গল পাণ্ডে, মিলখা সিংহ, লতা মঙ্গেশকর, কারগিল যুদ্ধে শহিদ ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রাদের নামে নামকরণ করা হবে। পরিবর্তন করা হবে শাহিবাবাদ, নজফগড়, হাউজখাস প্রভৃতি এলাকার নামও। ইতিমধ্যে অবশ্য মহম্মদপুর গ্রামের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব দক্ষিণ দিল্লি পুরনিগমে পাশ হয়ে গেছে। এমনকী, পুরানো নাম ফলকের উপর নতুন নামফলক লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এ পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন একশ্রেণীর রাজনীতিক, সেকুলারবাদী বুদ্ধিজীবী তথা মুসলমান তোষণকারী। শুরু হয়েছে বিতর্কও। তোষণকারীদের অভিযোগ, বিজেপি

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে নাম পরিবর্তন করতে চায়। আর এ ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয়, সেকুলারবাদীরা কত বড়ো ভারত বিদ্বেষী, সংখ্যালঘু তোষক।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মূলত ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে আরব দস্যুরা প্রথম ভারত অভিযান করলেও বিভিন্ন কারণে সেই অভিযান পরিত্যক্ত হয়। তবে ৭১১ খ্রিস্টাব্দেবিন্-কাশিম সিন্ধু জয়ের মধ্য দিয়ে ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত করে। তারপর তুর্কি ও মোগল আক্রমণ ঘটে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রায় কয়েকশো বছরের মুসলমান শাসনকালে ভারতে ঘটে যেমন বিপুল হিন্দু হত্যা, নারী ধর্ষণ, ধর্মান্তরকরণ ও লুণ্ঠন, তেমনি ঘটে হিন্দু ধর্ম, সংস্কৃতি, মঠ, মন্দির তথা শ্রদ্ধা বিন্দুগুলির উপর বিশাল আঘাত। ফলে অধিকাংশ হিন্দু বিধর্মী শাসকদের অত্যাচার, উৎপীড়ন, শাসন ও মৃত্যু ভয়ে স্বৈরাচারকে মেনে নিতে হয় বাধ্য এবং হারিয়ে ফেলে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা। আর তারই সুযোগ নিয়ে অত্যাচারী মুসলমান শাসকরা হিন্দু মঠ-মন্দির ভেঙে তার উপরে নির্মাণ করে মসজিদ। আবার কোথাও-বা মঠ-মন্দিরগুলিকেই মসজিদে রূপান্তরিত করে। অযোধ্যার রামমন্দিরও ভেঙে তার উপর বাবরি মসজিদ নির্মাণ তারই উদাহরণ। তাছাড়া অসংখ্য স্থানের নামও পালটে ইসলামি নামকরণ করাও হয়। এলাহাবাদ, হায়দরাবাদ ইত্যাদি নামকরণ ওই একইভাবে হয়েছে। এলাহাবাদের নাম ছিল প্রয়াগরাজ। আর হায়দরাবাদের নাম ছিল— বাগনগর। কাজেই দিল্লির একটি এলাকার নাম যে মহম্মদপুর হবে তা বলাই বাহুল্য।

খ্রিস্টান সাম্রাজ্যবাদীদের ক্ষেত্রেও ওই একই কথা প্রযোজ্য। তাদের প্রায় দু'শো বছরের শাসনকালে ভয় বা প্রলোভন দেখিয়ে অসংখ্য হিন্দুকে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করেছেন পাদরিরা। বহু স্থানের নামও বদলে ফেলা হয়েছে।

ভারতে আজ হিন্দুত্বের জাগরণ ঘটেছে। তাই হিন্দুরা আজ সাম্রাজ্যবাদীদের কুকর্মকে মুছে ফেলতে চাইছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের কলঙ্কচিহ্ন মুছে ফেলেছে। এর মধ্যে রয়েছে দেশপ্রেম। সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। হিন্দুদের দাবি, বিধর্মী সাম্রাজ্যবাদীদের শাসনকালে ভারতের যে সব স্থানের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে, সেইসব নাম বাতিল করে আগের নামে ফিরিয়ে আনা হোক। কারণ এর সঙ্গে হিন্দু জাতি ও ভারতের অস্মিতার প্রশ্ন জড়িত। হিন্দুরা চায় না, ভারত আবার বিধর্মীদের শাসনের চলে যাক, সাম্রাজ্যবাদীদের ভারত দখলের ষড়যন্ত্র সফল হোক। তাই এই কাজটি করতেই হবে। □

ছোটোদের একটু সময় দিন

ঈশানী মল্লিক

নাঃ। পরিবার, ঘরের মানুষের কথা শোনার একটু সময়ও নেই আজ আমাদের অনেকের হাতে। প্রশ্ন উঠছে কী কথা? সামান্য একজন মানুষের মনের কথা বা কারও কোনো সমস্যার কথা। সত্যি বলুন তো আমাদের কারোর হাতে কি আর এত সময় আছে, ফোনে কথা বলার? আমরা তো এখন স্ক্রিন স্যাভি। নিতান্ত দরকার না পড়লে কেউ কাউকে আর ফোনই করি না। ফোন তুলেই বলি, 'এই শোন না.... ফোন করলাম অমুক দরকারের জন্য... কাজটা করে দেবে প্লিজ?' হয়তো তার সঙ্গে শেষ কথা হয়েছে ছ'মাস আগে। তাতে কী?

এরমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াতে তার ছবিতে কয়েকটা লাইক আর দুটো কমেন্ট তো করা হয়েছে। এতেই মনে হচ্ছে যেন রোজ কথা হয়। একে-অপরকে ফোন করে কেউ জিজ্ঞাসাও করে না, কী কেমন আছ... ইত্যাদি। কারণ সোশ্যাল মিডিয়াতে রোজ 'ভার্চুয়াল' দেখা তো হচ্ছেই। সোশ্যাল সাইটে অনলাইন থাকা সে আমার হাতের কাছে যেন রয়েছে। এই ধরনের ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে বাস করেও আমরা এখনো কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন ব্যবহার করি যেন মনে হয় কোন মধ্যযুগে পড়ে রয়েছি। কয়েক বছর আগেই পরিচালক মৈনাক ভৌমিকের 'জেনারেশন আমি' মুক্তি পেয়েছে। বরাবরই মৈনাক অন্য ধরনের ছবি তৈরি করে নতুন প্রজন্ম থেকে আগেকার মানুষ প্রত্যেককেই প্রায় বাস্তব বুঝিয়ে ছাড়েন। সেবারেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ছবিটা দেখতে দেখতেই মনে হয়েছিল, 'আরে, এ তো আমার বাড়ির গল্প। কিংবা কেউ ছবিটা দেখতে দেখতে ভাবছিলেন, 'সত্যি, আমি তো কিছুটা এই চরিত্রেই মতোই। তাহলে কি আমার নিজেকে বদলানো উচিত?' আমরা নিজেরা বদলাবো কী না সে তো আমাদের আত্মপোলব্ধি থেকে বেরিয়ে আসা বহিঃপ্রকাশের ফলাফল। কিন্তু এটা তো ঠিক যে আমরা এখন চূড়ান্ত সামাজিক হয়ে কিছু কিছু জায়গায় মারাত্মক অসামাজিক!

আমাদের বাড়ির বড়ো ছেলে ডাক্তারি, ইনজিনিয়ারিং কিংবা আইআইটি-তে পড়ার সুযোগ না পেলে পাড়ার লোকজন, মর্নিং ওয়াকের বন্ধুরা, স্কুলের অন্য ছেলে-মেয়েদের বাবা-মা, আত্মীয়রা কে কী বলছেন তা নিয়ে কি সত্যি মাথা ঘামাই না? আমরা কোনো কিছুর জন্য নিজেকে ফেস করতে চাইলেও অন্যদের কাছে নিজেদের 'ভালোমানুষির ইমেজ'টা কখনই নষ্ট করতে চাই না। এই যে একই অঙ্গে দুটি রূপের চরিত্রের আমরা অনবরত অভিনয় করে চলেছি— এর মানসিক চাপ কি কম?

আমাদের শরীর, মস্তিষ্ক সবটাই একটা যন্ত্র। এতে যতটাই চাপ দেব ততটাই এটা বিকল হতে শুরু করবে। আমরা ভাবি, মানসিক চাপ বোধহয় আমাদের কর্মক্ষেত্রের চাপ, পড়াশোনার চাপ থেকেই হয়। নাঃ, সোশ্যাল ইমেজ ক্যারি করার চাপটাও এই মুহূর্তে আমাদের কাছে একটা বিশাল মানসিক চাপ। আমরা কে কতটা উঁচু দরে পৌঁছতে পারছি, ক'টাদিনের মধ্যে ভালো ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে দিচ্ছি, তাতে ঠিক কতগুলো লাইক, কমেন্ট ও ভিউয়ার হলো তা ক্রমাগত নজর করছি। তার সঙ্গে অন্যেরা কতটা এগিয়ে গেল বা পিছিয়ে–- এই যে একটা মানসিক র‍্যাট রেস, সব মিলিয়ে যে আমরা জেরবার হয়ে পড়ছি, তা আমরা নিজেরা সময় থাকতে বুঝতে পারছি না। সমস্যা যখন চরম পর্যায়ে চলে যাচ্ছে তখন আমাদের টনক নড়লেও বিশেষ কিছু করার আর থাকছে না।

এই যে আমরা বড়ো গোপনীয়তা বজায় রাখার খেলায় মেতেছি, এর শিকার কিন্তু আমাদের সন্তানসন্ততিরা। ছোটোদেরও যে বলার কিছু আছে, তারাও যে বাবা, মা এবং বাড়ির বড়োদের সান্নিধ্য চায়, সেটা আমরা বুঝতে পারি না। ছোটোরা যখন আপনার কাছে একটু সময় চেয়ে কথা বলতে চাইছে, তখন কাজ, সোশ্যাল সাইট, পার্টি, আড্ডা সবকিছু ছেড়ে তাদের একটু সময় দিন। মানে রাখতে হবে, ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডটা বাস্তব নয়। যখন বিপদে পড়বেন বা কাউকে পাশে চাইবেন, তখন কিন্তু বাস্তব সম্পর্কগুলোই কাজে লাগবে।

তাই লোকজন কী বলবে, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ভালো ইমেজ নষ্ট হবে, এসব না ভেবে ভার্চুয়াল জগৎ থেকে বাস্তব জগতে ফিরে আসুন। ছোটোদের সময় দিন। তাদের শৈশব নষ্ট করার দায়ী হবেন না। তাতে আপনি অনেক ভালো থাকবেন আর আপনার সন্তানসন্ততিও ভালো থাকবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বুঁদ হয়ে থাকতেই হবে, এই ধারণা বদলাবার সময় এসেছে। নইলে এগিয়ে থাকার বদলে চূড়ান্তভাবে পিছিয়ে পড়বেন। □

জিভ পরিষ্কার রাখা খুব জরুরি

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

অনেকেই দাঁত মাজার সঠিক নিয়ম জানেন না। দাঁত মাজা মানে শুধু দাঁত পরিষ্কার নয়, জিহ্বা ও মাড়িও পরিষ্কার করতে হবে। কেউ কেউ বলেন দিনে দু'বার দাঁত মাজা সত্ত্বেও মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। এর কারণ হলো জিহ্বা ঠিকমতো পরিষ্কার না করার ফলে জিহ্বাতে ব্যাকটেরিয়ার বাসা বাঁধা। ফলে যতই দাঁত জার্ম-ফ্রি টুথপেস্ট দিয়ে মাজা হোক না কেন শ্বাসের সঙ্গে একটা বাজে গন্ধ বের হতে থাকেই। তাই দাঁত মাজার সঙ্গে ব্রাশের উলটো দিকে বা টাং স্ক্র্যাপার দিয়ে জিহ্বা পরিষ্কার করা দরকার। জিহ্বা পরিষ্কারের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা—

১. দাঁত ক্ষয় থেকে বাঁচবে : মুখগহ্বরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে পর্যাপ্ত সচেতনতা নেই অনেকের। আর তার মধ্যে দাঁত তো অবহেলিতই, তার চেয়েও বেশি অবহেলা করা হয় জিহ্বাকে। দাঁত মাজার সময়ে তাতে আটকে থাকা খাদ্যকণা পরিষ্কার করা হলেও জিহ্বাতে ব্যাকটেরিয়া, খাবার রয়ে যায়। সেগুলো পরে দাঁতে আটকে গিয়ে দাঁতের ক্ষতি করে। আমরা ভাবি দাঁত মাজলাম মানেই সমস্ত ব্যাকটেরিয়া চলে গেল। কিন্তু আদৌ তা নয়। তাই জিহ্বা পরিষ্কার না রাখলে মুখগহ্বরের পরিচ্ছন্নতা অসম্পূর্ণ থাকে।

২. জিহ্বার বাহ্যিক অবস্থা : নোংরা জিহ্বায় এক ধরনের আস্তরণ তৈরি হয়। আর সেজন্যই তার উপরে সাদা বা ধূসর একটা স্তর পড়ে। ব্যাকটেরিয়া ও খাদ্যকণা মিলে এই আস্তরণ তৈরি হয়। সঙ্গে দোসর হিসেবে যোগ হয় জিহ্বার মৃত কোষ। ভালোভাবে পরিষ্কার করলে এটি উঠে যায়। তবে মনে রাখবেন, জিহ্বা খুব জোরে ঘষবেন না, কেন না এটি ছড়ে গিয়ে আঘাত লাগতে পারে মারাত্মকভাবে। আলতোভাবে নিয়মিত ঘষলেই এর স্বাভাবিক গোলাপি বর্ণ ফিরে এসে জিহ্বা থাকবে সুস্থ ও স্বাভাবিক।

৩. স্বাদ ঠিকমতো উপভোগ করতে : জিহ্বার স্বাদকোরকগুলি ঠিক রেখে খাবারের স্বাদ ঠিকমতো নিতে জিহ্বা নিয়মিত পরিষ্কার রাখা খুবই দরকার। কেননা এর উপর আস্তরণ পড়তে থাকলে খাবারের স্বাদ ঠিকমতো উপভোগ করা যাবে না। তাই প্রিয় খাবারকে আয়েশ করে খেতে গেলে দাঁত, মাড়ি ও জিহ্বা তিনটিরই সুস্বাস্থ্যের প্রয়োজন।

৪. দুর্গন্ধ দূর করতে : দিনে হয়তো আপনি দু-তিনবার খাওয়ার পরে ব্রাশ করছেন। আবার মাউথওয়াশ দিয়ে মুখও ধুচ্ছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার মুখের দুর্গন্ধ যাচ্ছে না। অনেক ভেবেও কারণটা আর কিছুই নয়, জিহ্বায় ব্যাকটেরিয়া আর খাবারের কণা জমতে জমতে সেখান থেকেই বাজে গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে।

৫. হজমের জন্যও দরকার : আপনি জানেন কি, জিহ্বাতে এমন সমস্ত ব্যাকটেরিয়া থাকে যা হজমের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে? জিহ্বা নিয়মিত পরিষ্কার না করলে সেগুলি খাবারের সঙ্গে অন্ত্রে প্রবেশ করে। ফলে সেখান থেকে নানাবিধ সমস্যা হয়। □

রাজপুত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি আচরণে ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ। আত্মচেষ্টায় তিনি জীবনের চরম সত্যকে জেনেছিলেন। মানবজাতির ত্রাণকর্তা হওয়ার লিপ্সা তাঁর ছিল না। তিনি মানুষকে মুক্তির পথের সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন।

মানব কল্যাণের জন্য রাজ্যপাট ছেড়েছিলেন যে রাজকুমার

নিখিল চিত্রকর

রাজার ছেলে রাজা হবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু এ ছেলের জন্ম মানব কল্যাণের মহৎ স্বার্থে। এ ছেলে মোক্ষপ্রাপ্তির ধারায় আসমুদ্র হিমাচলে অহিংসা ও সত্যের বাণী প্রচার করবেন উজানের প্রতিকূলে হেঁটে। হবেন গৃহত্যাগী। স্থাবর জঙ্গমের সমস্ত মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে বুদ্ধত্ব লাভ করবেন। খ্যাত হবেন গৌতম বুদ্ধ নামে।

হিমালয়ের পাদদেশে কোশল রাজ্যের রাজা শুদ্ধোদন। রাজধানী কপিলাবস্তু নগরে রাজরানি মায়াদেবীর কোল আলো করে একদিন জন্ম নিলেন এক দেবশিশু। নাম রাখা হলো সিদ্ধার্থ। জন্মের দিন কয়েক পরে মাতৃহারা হন সিদ্ধার্থ। মা-মরা শিশুটি বড়ো হতে থাকলো মাসি গৌতমীর স্নেহচ্ছায়ায়। তাঁর নাম থেকেই পরবর্তীকালে সিদ্ধার্থের নাম হয় গৌতম।

সিদ্ধার্থ রাজপ্রাসাদের সুখ, ঐশ্বর্য, আতিশয্যের মধ্যেই বড়ো হচ্ছিল। একদিন কোষ্ঠিবিচার করে কুলপুরোহিত ঋষি অসিত রাজা শুদ্ধোদনকে জানালেন, এ ছেলের সন্ন্যাস যোগ রয়েছে। সিদ্ধার্থকে আগলে রাখার নানা চেষ্টা-চরিত্র করলেন শুদ্ধোদন। তাঁকে রাজপ্রাসাদের গণ্ডির মধ্যেই আটকে রাখার রাখার ব্যবস্থা হলো। পঠনপাঠন, সংগীতচর্চা, ছবি আঁকা, অস্ত্রশিক্ষা সবই চলতো রাজপ্রাসাদের চৌহদ্দির মধ্যে।

শৈশব থেকেই পার্থিব বিষয়বস্তু নিয়ে উদাসীন ছিলেন সিদ্ধার্থ। রাজকীয় অশন-বশন তাঁর জীবনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করেনি। দেখতে দেখতে রাজকুমার যোলোয় পড়লেন। রাজকুমারী যশোধরার সঙ্গে তাঁর গাঁটছড়া বাঁধা হলো। সিদ্ধার্থ-যশোধরার জীবনে এলো পুত্র রাহুল। আজন্ম রাজপ্রাসাদের ঘেরাটোপে থাকা সিদ্ধার্থের একদিন হঠাৎ নগর পরিক্রমার শখ হলো। রাজপ্রাসাদের বাইরের পৃথিবীটা দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। কিন্তু রাজকীয় মণি-মাণিক্যময় আতিশয্য ছেড়ে বাইরের জগৎ দেখার এত কৌতুহল কেন সিদ্ধার্থের? কারণ এক খেলনা বিক্রেতার সঙ্গে পুত্র রাহুলের কথোপকথন।

সেদিন সিদ্ধার্থ সংগীতচর্চা করছিলেন। তখনই কানে এলো রাহুলের চিৎকার। তার খেলনা চাই। সিদ্ধার্থের নির্দেশে মলিন পোশাক পরা এক খেলনা বিক্রেতা প্রাসাদের ভিতরে

আসার অনুমতি পেল। ঝুড়ির সব খেলনা রাহুলের পছন্দ। সবগুলোই কেনা হলো। তবে রাহুলের আবদার, খেলনা বিক্রেতাকে সে নিজের হাতে তার মূল্য দেবে। সেইমতো বিক্রেতার হাতে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিতে গেল রাহুল। স্বর্ণমুদ্রা দেখে ঘাবড়ে গেলেন বিক্রেতা। এক ঝুড়ি খেলনা কেন, দশ ঝুড়ি খেলনাও ওই স্বর্ণমুদ্রার মূল্যের সমান নয়। এত পারিশ্রমিক তার স্বপ্নের অতীত। দিন আনে দিন খায়। মোহর নিয়ে সে কী করবে? বরং তার কাছে স্বর্ণমুদ্রা দেখলে লোকে তাকেই চোর মনে করবে। তাকে তার ন্যায্য মূল্য দিয়ে বিদায় করা হোক এমনই দাবি করলো খেলনা বিক্রেতা।

কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে সবকিছু নিরীক্ষণ করছিলেন সিদ্ধার্থ। তাঁর মনে তখন প্রশ্নের ঝড়। কে ওই লোকটি? এত মলিন পোশাক, জীর্ণ-শীর্ণ! স্বর্ণমুদ্রা ওর কাছে থাকলে সবাই ওকে চোর ভাববে কেন? লোকটির সঙ্গে রাজপ্রাসাদে থাকা মানুষগুলোর আদব-কায়দার কোনো মিল নেই। কেন?

সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পিতা শুদ্ধোদনের অগোচরে সারথি ছন্দককে সঙ্গে নিয়ে সিদ্ধার্থ চললেন নগর পরিক্রমায়। পথে দেখলেন মানুষে-মানুষে কলহ, সংকীর্ণতা, মিথ্যা-দলাদলি। দরিদ্রের হাড়ভাঙা পরিশ্রম, অভাব অনটন-দুঃখ-দুর্দশা। এইসব বাস্তবের সঙ্গে আশৈশব অজ্ঞাত রাজপুত্রের মন হাহাকার করে উঠলো। কিন্তু আরও কিছু তাঁর দেখার বাকি ছিল। সিদ্ধার্থ দেখলেন ব্যাধি, জরা ও অবশেষে মৃত্যু।

নগর পরিক্রমার সময় প্রথমদিন একজন বৃদ্ধ, দ্বিতীয়দিন একজন জরাগ্রস্ত ব্যক্তি, তৃতীয়দিন একজন মৃত ও চতুর্থদিন একজন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পেয়ে তিনি তাঁর সারথিকে প্রশ্ন করে জানতে পারেন জগৎ দুঃখময়। সিদ্ধার্থ উপলব্ধি করেন সংসারে মায়া; রাজ্যপাট, ধন-সম্পদ, সম্পর্ক কিছুই স্থায়ী নয়। অপরিসীম বিষাদে আচ্ছন্ন হলেন রাজপুত্র। বহুরাত বিনিদ্র অবস্থায় কাটে তাঁর। ক্রমে তাঁর এই বোধ জাগ্রত হলো, মৃত্যু যদি মানুষের জীবনে ধ্রুব সত্য হয়; তবে নিরন্তর কর্ম করে যেতে হবে। কারণ কর্ম না করলে প্রারব্ধ কাটে না। প্রারব্ধ না কাটলে মোক্ষলাভ হয় না। মোক্ষ না মিললে আবার জন্ম, আবার কষ্ট, ও মৃত্যু— এই চক্র নিরন্তর চলতে থাকবে। অসহায়, আর্ত মানুষগুলোকে মুক্তির পথ দেখাতে হবে। সর্বত্যাগী হয়ে জগৎকে ত্যাগের মহিমা বোঝাতে হবে। তার জন্য এই রাজপ্রাসাদ, এই ঐশ্বর্য ছেড়ে নামতে হবে পথে। এই ক্ষুদ্র পরিসরের সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে বৃহৎ কর্মযজ্ঞে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে। গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন সিদ্ধার্থ।

অবশেষে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। এবার মহাভিনিষ্ক্রমণ করবেন, পাড়ি দেবেন সত্যকে জানতে শাক্যরাজপুত্র গৌতম। রাত তখন দুই প্রহর। শয়নঘরের কপাট ধীরে ধীরে খুললেন সিদ্ধার্থ। অন্দরে স্ত্রী যশোধরা ও শিশুপুত্র রাহুল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সকল মোহের ঊর্ধ্বে উঠে সিদ্ধার্থ আজ পথে নামবেন। যে পথ বড়ো কঠিন। স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে সাংসারিক জীবনের আজই শেষ সম্পর্ক। পরিজনদের কথা ভেবে একবার থমকে দাঁড়ালেন। পরক্ষণেই এগোলেন। যেতে হবে তাঁকে। মানুষ বড়ো কাঁদছে। মানুষের যে কষ্টের রূপ তিনি দেখেছেন তার কাছে এই রাজকীয় বিলাস-ব্যসন তুচ্ছ। প্রাসাদের রোশনাই ছেড়ে তমসাচ্ছন্ন পথে হাঁটতে থাকলেন সিদ্ধার্থ। পিছনে পড়ে রইল ভোগবিলাসের বাহুল্যে ভরা রাজকীয় জীবন। তখন তাঁর বয়স ২৯ বছর। এই মহাভিনিষ্ক্রমণ অবশ্যম্ভাবী ছিল। সমস্ত মানবের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। রাজার পুত্র হয়েও সোনা-রুপোয় মোড়া কোনো রাজপ্রাসাদের নীচে জন্মগ্রহণ করেননি। রাজধানী কপিলাবস্তুর লুম্বিনী উদ্যানে মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে নীল আকাশের নীচে আবির্ভূত হন সনাতন হিন্দু ধর্মের নবম অবতার। তারপর বুদ্ধগয়ার কাছে একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় উনপঞ্চাশ দিন ধরে তপস্যা করার পর বোধিপ্রাপ্ত হন সিদ্ধার্থ। এই সময় তিনি মানবজীবনের দুঃখ ও তার কারণ এবং দুঃখ নিবারণের উপায় সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন। যা 'চতুরার্য সত্য' নামে খ্যাত। তারপর তিনি 'বুদ্ধ' (পরম জ্ঞান) বা তথাগত (যিনি সত্যের সন্ধান পেয়েছেন) নামে পরিচিত হন।

রাজপুত্র হওয়া সত্ত্বেও গৌতম বুদ্ধ আচরণে ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ। আত্মচেষ্টায় তিনি জীবনের চরম সত্যকে জেনে ছিলেন। মানবজাতির ত্রাণকর্তা হওয়ার লিপ্সা তাঁর ছিল না। তিনি মানুষকে মুক্তির পথের সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধ তাঁর অনুগামীদের আত্মনির্ভর হতে এবং নিজেদের মুক্তির জন্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

পৃথিবীতে বুদ্ধের মতবাদ অন্যতম প্রধান ধর্মমত রূপে বিবেচিত হয়। কারণ এটি এক উচ্চমার্গীয় আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা এবং মহৎ জীবন ব্যবস্থা যা সূক্ষ্ম নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। এক বাস্তবধর্মী সংস্কারকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গৌতম বুদ্ধের। যে ক্ষত্রিয় রাজপুত্র এক খেলনা বিক্রেতার জীবনযাপন দেখে প্রাসাদের প্রাচীর লঙ্ঘন করে তার কারণ খুঁজতে বেরিয়ে পড়েন, তিনি জগৎটাকে বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন এটাই স্বাভাবিক। আমরা তো কত ভিক্ষাজীবী মানুষকে ভিক্ষা দিই। শুধু কয়েকটা খুচরো টাকা দিয়েই দায় সারি। কখনো কি চোখ মেলে তার দারিদ্র্য বা দুঃখের কারণ উপলব্ধি করি?

গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্মে এই বাস্তব সংস্কার সচেতন মানসিকতার প্রতিফলন রয়েছে সর্বত্র। বৌদ্ধ কোনো স্বতন্ত্র ধর্ম নয়। একটি ধর্মমত। সনাতন ধর্মের অন্যতম পন্থা। এ পন্থা মানুষকে পবিত্র জীবন যাপন করতে নির্দেশ দেয়। এ পন্থার বাণী হলো শিষ্যদের দেওয়া গুরুর নৈতিক উপদেশ। যথার্থ বিশ্বাস, সৎ কার্য, অনাড়ম্বর জীবন যাপন ইত্যাদি। এগুলো সব ধর্মেরই মূল কথা। বস্তুত বুদ্ধ কোনোদিন হিন্দু ধর্মের বাইরে যাননি। সনাতন হিন্দু ধর্মের পরিধির মধ্যে থেকেই তিনি অচলায়তনকে ভেঙে বৌদ্ধ ধর্মমতকে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্মমতে উপনিষদের 'কর্মবাদ'-এর প্রাধান্য তারই প্রমাণ। রাজার ছেলে হয়েও যাবতীয় ঐশ্বর্যে তাঁর অনীহা পারতপক্ষে শাশ্বত ত্যাগের নিদর্শন। গৌতম বুদ্ধের বাণীতেই উদ্ধৃত, 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি' সঙ্ঘম্ শরণং গচ্ছামি। যার মর্মার্থ, আত্মচেতনার জাগরণে বৌদ্ধিক সত্তার শরণ নিলাম। আমি ধর্মের শরণাগত হলাম। আমি বৌদ্ধ সঙ্ঘের শরণাপন্ন হলাম। ■

মানবপ্রেমিক মহামানব তথাগত বুদ্ধ

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

ভারতবর্ষ হলো ঈশ্বর সাধনা তথা আধ্যাত্মিকতার সর্বোত্তম গবেষণাগার। যুগে যুগে বহু নতুন নতুন মত-পথ-উপাসনা পদ্ধতির বিকাশ হয়েছে এদেশে। পাঁচ হাজার বছর আগে দ্বাপর যুগ সমাপ্ত হওয়ার পরে শ্রীকৃষ্ণের লীলা সংবরণের পর শুরু হলো কলিযুগের। সেই অবতার পুরুষের ছায়াও কালক্রমে বিলীন হলো। আবার ধীরে ধীরে সমাজে পুনরায় গ্লানি জমা হতে শুরু হলো। মানুষ সনাতন ধর্মের মূল কথা ঈশ্বরোপলব্ধি ও ঈশ্বরোপাসনা ছেড়ে অপ্রয়োজনীয় আচার সর্বস্বতায় ডুবে গেল। হাজার হাজার বছরের হিন্দু পদ্ধতির মূল ভিত যে চতুরাশ্রম ও বর্ণ ব্যবস্থা— যা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের ভিত্তি ছিল তা নিয়েও মানুষের মধ্যে ভ্রম সৃষ্টি হলো। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বর্ণ ব্যবস্থার যে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন— 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগশঃ'। অর্থাৎ জন্মের ভিত্তিতে নয়, গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণ বিভাজনকে অবজ্ঞা করে এক সুপ্রাচীন অনিন্দ্যসুন্দর বর্ণ ব্যবস্থাকে জন্মভিত্তিক, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, ছোঁয়া-ছুঁত ও জাতিভেদের জালে জড়িয়ে ফেলল। যার বিষময় ফল হলো মানুষে মানুষে ঘৃণা, অবজ্ঞা, নির্মম ব্যবহার। এমনই এক যুগ সন্ধিক্ষণে তথাগত বুদ্ধের আবির্ভাব। ভারতবর্ষকে তিনি মুক্তির পথ দেখাতেই আবির্ভূত হয়েছিলেন।

সিদ্ধিলাভের পর বুদ্ধদেব তখন বোধগয়াতেই অবস্থান করছেন। একদিন নগরের পথ ধরে হেঁটে চলেছেন। এক শূদ্র যুবক, ঝাড়ুদার সুনীত পথে ঝাঁট দিচ্ছিল, তখন দুপুর। সন্ন্যাসীকে দেখে সুনীত ঝাড়ু ফেলে পথের এক কোণে সন্তর্পণে দাঁড়িয়ে রইল। তথাগত স্মিত হেসে তার দিকে এগোতেই সুনীত আরও পিছিয়ে যেতে থাকল। একসময় সে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠল— প্রভু, আমাকে ছুঁয়ে আর আমার পাপের ভার বাড়াবেন না। তথাগত আরও এগিয়ে গেলেন। পথের ধারে বেড়ার শেষ প্রান্তে সুনীতের আর পিছানোর জায়গা নেই। শেষবারের মতো সে বলে ওঠে, — প্রভু ক্ষমা করুন, আমি ভাঙ্গি, ছোটো জাত, পাপী অধম। আমার ছোঁয়া লাগলে আপনার অকল্যাণ হবে। তবু তথাগত ধীরে এগিয়ে চলেছেন সুনীতের দিকে। ভয়ে সে দু'চোখ বন্ধ করে ফেলল। মাঝে কয়েক পলের ব্যবধান। সে অনুভব করল একটি কোমল শরীর তাকে দু' হাতে আলিঙ্গন করে রয়েছে। চোখ খুলে সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল— এ কী করলেন প্রভু! আমি যে মহাপাপী। আমার যে মরা ছাড়া আর কোনো পথ রইল না। তথাগত হেসে বললেন— মরলে দুজনেই মরব, কারণ আমার ভেতরে যে ঈশ্বর, তোমার ভেতরেও যে তাই। চল আমার সঙ্গে, আমরা সেই পরম পুরুষের কাছে যাই। বিস্ময়ে আনন্দে সুনীতের দু'চোখে জলের ধারা। বলে— প্রভু আপনার মতো আজ পর্যন্ত আমাকে কেউই জড়িয়ে ধরা তো দূর,

ছায়া পর্যন্ত মাড়ায়নি, সকলে শুধু নীচু জাত বলে ঘৃণাই করেছে। আপনি আমাকে মানুষের মর্যাদা দিলেন। তথাগত সঙ্গে নিয়ে চললেন তাকে। দীক্ষা হলো তার। জাতি ভেদে দীর্ণ সমাজ পেল নতুন জীবনীশক্তি। সুনীতের কণ্ঠে মন্দ্রিত হলো— বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।'

ধীরে ধীরে বুদ্ধের অনুগতের সংখ্যা বাড়তে লাগল। এতে উচ্চবর্ণের পণ্ডিতরা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল। তারা কাশীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অশ্বালায়নকে পাঠালেন বুদ্ধকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত ও অপমানিত করতে। কাশীর এক বিরাট শিবালয় প্রাঙ্গণে শুরু হলো তর্কযুদ্ধ। বুদ্ধ প্রশ্ন করলেন মানুষের জন্ম ঈশ্বরের অধীন, মানুষের হাতে নয়, তবে শূদ্রের ঘরে জন্ম হলে তার কী দোষ? তাছাড়া মানুষের শ্রেষ্ঠতা তো তার কর্মে, জন্মে নয়, তবে সে শূদ্র নীচ কীসে? চারবর্ণের মানুষ যদি ঈর্ষা, দ্বেষ, লোভ, চৌর্যবৃত্তি প্রভৃতি কর্ম থেকে বিরত থেকে সৎভাবে জীবনযাপন করে তবে কি দুজনেরই স্বর্গপ্রাপ্তি হবে না? ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাক্যহারা। বুদ্ধ বললেন, এক ব্যক্তি চরিত্রবান, অন্যজন ভ্রষ্ট— কার মহত্ত্ব বেশী? পণ্ডিত বললেন— চরিত্রবানের। বুদ্ধ বললেন— তবে বলুন একজন ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ এবং একজন চরিত্রবান শূদ্রের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নত মস্তকে নিশ্চুপ রইলেন। বিজয়ী হলেন তথাগত। দিকে দিকে নিম্নবর্ণের মানুষ এমনকী উচ্চ বর্ণের মানুষেরাও তাঁর শরণ নিয়ে ভক্ত হয়ে উঠল।

বৌদ্ধধর্মমত প্রায় এক হাজারেরও বেশি বছর সময়কাল ধরে এই দেশকে দিয়েছে নবীন জীবনী শক্তি। বৌদ্ধধর্মমত না থাকলে হয়তো হিন্দু ভারতবর্ষ একসময় ম্লেচ্ছ ভারতে রূপান্তরিত হয়ে যেত। এই সেদিনের কথা। ইংরেজ শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশে তখন স্বাধীনতা আন্দোলন তুঙ্গে। নেতারা বলছেন সব জাতপাত ভুলে এক হয়ে লড়তে হবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত। গান্ধীজী নিম্ন বর্ণকে সম্মান দিতে তাদের নামকরণ করলেন 'হরিজন'। কিন্তু তাতেও কিছু হলো না। হিন্দু সমাজভুক্ত চামার, মেথর, মাহার, ভাঙ্গি, ডোম, বাউড়ি, চণ্ডাল এদের প্রতি ঘৃণা কমল না। এরা আগের মতোই অপমানের জীবন কাটাতে লাগল। সারা দেশেই এক ছবি। এরা হিন্দু সমাজভুক্ত হয়েও যেন হিন্দুসমাজের কেউ নয়। এরা পশুর চেয়েও অধম। যে পুকুর ও কুঁয়ো থেকে পশুপাখি জল খেলে সে জল অশুদ্ধ হয় না, মুসলমান, খ্রিস্টান স্নান করলেও শুদ্ধ থাকে— সেই পুকুরের বা কুঁয়োর জল এরা একবার ছুঁয়ে ফেললে অশুদ্ধ হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়— এমনই ছিল সমাজের বিধান। এরা এতটাই নীচ যে জনসাধারণের চলা রাস্তাতেও যাতায়াত করা বারণ, সাধারণের সঙ্গে একই বাহনে চড়াও ছিল অন্যায়, এদের পরিবারের বালক-বালিকাদের স্কুলে একই আসনে বসা ছিল গর্হিত অপরাধ, এমনই মানবতাহীন অত্যাচার এই জাতির কণ্ঠরোধ করে রেখেছিল। হাজার বছরের ইসলামি শাসনে এদেশের উচ্চবর্ণের মানুষের অত্যাচারের কারণেই তো হাজার হাজার দলিত কখনও ভয়ে, আবার কখনও স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল। এমনকী ইংরেজ শাসনেও দলিতদের ওপর চলা এই অত্যাচার বন্ধ করা যায়নি। ঠিক এমনই সময়ে মহারাষ্ট্রে বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের নেতৃত্বে দলিতরা এই প্রথার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। আম্বেদকর নিজে ছিলেন মাহার সম্প্রদায়ের। বাল্যকাল থেকে অপমান সইতে সইতে প্রৌঢ় বয়সে এসে অনুভব করলেন 'এই হিন্দু ধর্মে আর নয়। কারণ এই উচ্চবর্ণ আমাদের সমাজকে কোনোদিন মানুষের সম্মান দেবে না। এরা ম্লেচ্ছ মুসলমান ও খ্রিস্টানকে ভাই-বন্ধু বলে বুকে টেনে নেবে, বাড়িতে ডেকে আতিথেয়তা দেবে কিন্তু হিন্দু সমাজেরই অঙ্গ যারা, সেই আমাদের ছায়া মাড়ানো পাপ বলে মনে করবে। তাই মানুষের সম্মান পেতে ধর্ম পরিবর্তন করতেই হবে।' খ্রিস্টান পাদরিরা তাঁকে খ্রিস্টান হতে আহ্বান জানাল। মোল্লা-মৌলবিরা অনেক চেষ্টা করল মুসলমান করার— কারণ তারা জানতেন আম্বেদকরকে একবার তাদের মতে আনতে পারলে লক্ষ লক্ষ দলিত হিন্দু তাদের দিকে স্বেচ্ছায় চলে আসবে। একথা আম্বেদকরও বুঝতেন, তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন— তিনি ধর্ম পরিবর্তন করলেও ভারতীয় সংস্কৃতির গণ্ডীর মধ্যেই থাকবেন। বিদেশি আদর্শ পুষ্ট খ্রিস্টান বা ইসলাম নয়, ভারতের সুপ্রাচীন সনাতন ধর্মের পুত্রস্বরূপ বৌদ্ধ ধর্মমতই তিনি গ্রহণ করবেন। বহুদিন থেকে তিনি মহাবোধি

সোসাইটিতে যাতায়াত শুরু করেছিলেন। বৌদ্ধ জীবনদর্শন নিয়ে পড়াশোনা গবেষণা, দেশ-বিদেশে ভাষণ দেওয়া এসব চলছিলই। অবশেষে ১৯৫৪ সালের ১৪ অক্টোবর বিজয়া দশমী তিথিতে নাগপুরের দীক্ষাভূমিতে কয়েক লক্ষ অনুগামীদের নিয়ে আম্বেদকর বৌদ্ধধর্মমত গ্রহণ করলেন। বেঁচে গেল ভারতবর্ষ। সেদিন যদি তিনি সদলে ইসলাম কিংবা খিস্টমত গ্রহণ করতেন তবে আজকের ভারত কেমন হতো তা আজ বর্ণনা করা কঠিন। ছাব্বিশশো বছর আগে ভগবান বুদ্ধ সমাজের অন্ত্যজ ঝাড়ুদার সুনীতকে বুকে জড়িয়ে যেভাবে আপন করে নিয়েছিলেন, আজ এত বছর পরে সেই তথাগতর প্রেমের আদর্শ লক্ষ লক্ষ অবহেলিত অপমানিত হিন্দুকে নিজের বুকে ঠাঁই দিয়ে রক্ষা করল এই দেশকে।

সারা পৃথিবীতে প্রেম ও শান্তির বাণী যিনি প্রচার করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন সেই খ্রিস্টধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা যিশুখ্রিস্টও তাঁর এই প্রেম ও শান্তির পাঠ নিয়েছিলেন কাশ্মীরের এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে। যিশু মাত্র ১৪ বছর

বয়সে কাশ্মীরে এসে বৌদ্ধ ধর্মের সাধনা করেন। কাশ্মীরে 'যিশুরা সমাধি' নামে এক দরগা আজও সেই স্মৃতি বহন করে চলেছে। প্রখ্যাত রুশ প্রবন্ধকার ও পর্যটক নিকোলাই আলেকজান্দ্রভিচ ১৮৯৪ সালে যিশুর জীবন নিয়ে 'দ্য আননোন লাইফ অব জেশাস খ্রাইস্ট' নামে একটি বই লেখেন। গবেষণার জন্য ১৮৮৭ সালে তিনি লাদাখের হেমিসে এসে এক গুম্ফায় আশ্রয় নেন। সেখানকার প্রধান লামা তাঁকে দেখান দুটি বিবর্ণ পুঁথি। তাতে বর্ণিত ছিল যিশুর ১৪ বছর বয়সে ভারত ভ্রমণ ও এখানকার হিন্দু ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ লামার কাছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের কথা। নিকোলই সেখানে শোনেন যিশুর নেপালে গিয়ে বুদ্ধের জন্মস্থান দর্শন এবং বারাণসী উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থানে শিক্ষা গ্রহণের কথা। স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই তথা শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী অভেদানন্দও হেমিসে গিয়ে স্বচক্ষে সেই তিব্বতি পুঁথি দেখে বিস্মিত হন। দেখেন সেই পাণ্ডুলিপিতে ঈশা নামে এক পশ্চিমি জ্যোতির্ময় মানবের উল্লেখ আছে। স্বামী অভেদানন্দ পরে ২২৪টি যিশু বিষয়ক পঙ্‌ক্তি বাংলায় অনুবাদ করে লেখেন তাঁর কালজয়ী রচনা 'কাশ্মীর ও তিব্বতে।' গুপ্তযুগে সংকলিত হিন্দুদের ১৮টি পুরাণের মধ্যে 'ভবিষ্যত পুরাণে' কাশ্মীর রাজার সঙ্গে যিশুর সাক্ষাতের দৃশ্য বর্ণিত আছে। নিউ টেস্টামেন্টে যিশুর ১৪ থেকে ২৯ বছর বয়স পর্যন্ত সময় কালের বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায় না, যা আজও রহস্যাবৃত। —ঠিক এই সময়টাই ছিল যিশুর কাশ্মীরে এসে তথাগত বুদ্ধের সাধনায় ব্যাপৃত থাকার কাল।

বৌদ্ধ ধর্মমত হিন্দুধর্মেরই একটি শাখা মাত্র। এদেশে জৈন, শাক্ত, শৈব্য, গাণপত্য, বৈষ্ণব, শিখ যেমন এক একটি মত ও উপাসনা পদ্ধতি, বৌদ্ধও তাই। হিন্দু ধর্মের যে দশটি মৌলিক সিদ্ধান্ত আছে যেমন— ধৃতি, ক্ষমা, দমঃ, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ—বৌদ্ধ ধর্মেরও প্রায় তাই, যেমন--- সম্যক দৃষ্টি, সৎকর্ম, সৎবাক্য, সৎসংকল্প, সৎচেষ্টা, সৎজীবন, সৎস্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এগুলি হলো অষ্টাঙ্গিক মার্গ। শুধু প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য আছে মাত্র। হিন্দু সন্ন্যাসীর মতো গৈরিক বস্ত্র, মুণ্ডিত মস্তক, উপাসনালয়, ধ্যান, যোগ, আচার-বিচার সবদিক থেকে হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই, বরং সাদৃশ্যই বেশি। হিন্দুরা বুদ্ধদেবকে ঈশ্বরের অবতার রূপে মানেন। শ্রীভাগবতে দশ অবতারের মধ্যে বুদ্ধ অবতারেরও উল্লেখ আছে। আদি শঙ্করাচার্য্য যিনি এক বিরাট জনগোষ্ঠীকে বৌদ্ধ থেকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে পরাবর্তন করিয়েছিলেন তিনিও ভগবান বুদ্ধকে বিষ্ণুর নবম অবতার রূপে বর্ণনা করেছেন। তাই হিন্দুর ঠাকুর ঘরে আজ কালী, শিব, কৃষ্ণ, রামের পাশাপাশি তথাগত বুদ্ধের মূর্তিও বিরাজিত ও পূজিত। স্বামীজী হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সমন্বয়ের বিশ্বাসী ছিলেন। ১৮৯৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর চিকাগোর বিশ্বধর্মসভার যোড়শ অধিবেশনের ভাষণে তিনি বলেছিলেন— 'বৌদ্ধধর্ম ছাড়া হিন্দুধর্ম বাঁচিতে পারে না, হিন্দু ধর্ম ছাড়িয়া বৌদ্ধধর্মও বাঁচিতে পারে না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের এই বিচ্ছেদই ভারতের অবনতির কারণ। এজন্যই আজ ভারত ত্রিশকোটি ভিক্ষুকের বাসভূমি হইয়াছে। এই জন্যই ভারতবাসী সহস্র বছর ধরিয়া বিজেতাদের দাসত্ব করিয়াছে। অতএব আসুন, আমরা ব্রাহ্মণদের অপূর্ব ধীশক্তির সহিত লোকগুরু বুদ্ধের হৃদয়, মহান আত্মা এবং অসাধারণ লোক কল্যাণশক্তি যুক্ত করিয়া দিই।'

বুদ্ধপূর্ণিমা আমাদের কাছে বিশেষ বার্তাবহ। কোনো যুদ্ধ ছাড়াই, তরবারির ঝনঝনানির শব্দ ব্যাতিরেকে, বন্দুকের একটিও গুলি খরচ না করে কেবল প্রেম ও শান্তি বাণীর শক্তিতে বৌদ্ধধর্ম আজ চীন, জাপান, শ্রীলঙ্কা, মায়ানামার, নেপাল, ভুটান, থাইল্যান্ড, মঙ্গোলিয়া কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশের জাতীয় ধর্ম বা জনগণের ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যা সারা পৃথিবীর জনগোষ্ঠীর একতৃতীয়াংশ ভারত বুদ্ধের জন্মভূমি, কর্মভূমি ও মোক্ষভূমি। তাই তাঁকে বারে বারে স্মরণ আমাদের কর্তব্য। বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর আবির্ভাব, এই তিথিতেই তাঁর 'বোধি' অর্থাৎ জ্ঞান লাভ এবং এই পবিত্র তিথিতেই বিহারের কুশীনগরে তাঁর 'মহানির্বাণ' অর্থাৎ চির শয্যার দিন। তাই এমনই পবিত্র দিনকে স্মরণ ও মনন আমাদের সনাতন সংস্কৃতিকে আরও সুদৃঢ় করবে। ■

ফঃ ৪

যশোধরার আলোয় উজ্জ্বল বুদ্ধের সাধনপথ

অনন্যা চক্রবর্তী

সবাই দেখতে পায় তাঁকে। ষোড়শ জনপদের প্রতিটি গৃহের অলিন্দে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা দল বেঁধে চলেছেন। পুরোভাগে তিনি, অমিতাভ বুদ্ধ। নির্বাণ লাভের পর তিনি মস্তক মুণ্ডন করেছেন। ধারণ করেছেন গৈরিক বস্ত্র। দেশসুদ্ধ মানুষ বুদ্ধের কৃপালাভের জন্য উন্মুখ। যশোধরার কানে কত কথাই তো আসে। তিনি সিদ্ধার্থের স্ত্রী। আজ যিনি অমিতাভ বুদ্ধ, তাঁরই পূর্বাশ্রমের নাম সিদ্ধার্থ। কপিলাবস্তুর রাজপুত্র তিনি। শুদ্ধোধন ও গৌতমী মায়ের প্রিয় সন্তান। সেই রাতটার কথা ভুলতে পারেন না যশোধরা। রাহুলকে পাশে নিয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আর সেই অবসরে... না, সিদ্ধার্থকে কোনও কটূ কথা বলতে চান না যশোধরা। আত্মীয়-পরিজনেরা তাকে সান্ত্বনার নামে দোষ দেয়। ছোট্ট রাহুল বাবার কাছে যাবার জন্য বায়না করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যশোধরা সারাক্ষণ নির্মল আনন্দে ডুবে থাকেন। কারণ তিনি আগে থেকেই জানতেন এইরকম হবে। বিবাহের পূর্বে রাজজ্যোতিষী সিদ্ধার্থের কোষ্ঠীবিচার করে সাবধান করে দিয়েছিলেন, এই ছেলে একদিন গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। এর পরেও সিদ্ধার্থের দীপ্তিময় চোখ ও অপাপবিদ্ধ হাসির মায়া ত্যাগ করতে পারেননি যশোধরা।

গঙ্গারিডাইয়ের উত্তরাংশে একটি ছোটো গণরাজ্য। তার রাজা সুপ্পাবুদ্ধ এবং রানি অমিতা। একদিন খবর এল রানি সন্তানসম্ভবা। একই সময়ে শুদ্ধোদনের রাজ্য কপিলাবস্তুতেও খুশির আবহাওয়া। শুদ্ধোদনের স্ত্রী মায়াদেবীও সন্তানসম্ভবা। রাজজ্যোতিষীরা গণনা করে জেনেছেন দুই রানিরই পুত্রসন্তান হবে। তারা বলেছেন, এই দুই নবজাতক সাধারণ মানুষ নন। মানুষের কল্যাণের জন্য এরা পৃথিবীতে আসছে। কিন্তু জ্যোতিষীদের কথা মিলল না। কপিলাবস্তুতে মায়াদেবী পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেও, অমিতার কন্যাসন্তান হলো। কন্যাসন্তানের বাবা হয়ে গোড়ায় সুপ্পাবুদ্ধ মনোক্ষুণ্ণ হলেও, পরে জাতিকার লক্ষণ বিচার করে আনন্দে আত্মহারা হলেন। জাতিকার নাম রাখা হলো যশোধরা। কয়েক সপ্তাহ পরে পমিতার হঠাৎ মৃত্যু হলো। যশোধরা প্রাসাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে বড়ো হতে লাগল। কালক্রমে যশোধরা হয়ে উঠলেন রাজ্যের সেরা বিদুষী। তার রূপেরও জুড়ি মেলা ভার। যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়। কিন্তু অভিভাবকদের আক্ষেপ একটাই। মেয়ের স্বভাব মোটেই রাজকন্যাসুলভ নয়। প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে প্রসাদের কর্মচারীরা কেন তার মতো সুস্বাদু ও সুগন্ধী খাবার খায় না? কেন তাদের পোশাক এত মলিন? একই জায়গার মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কেউ বৈভবের মধ্যে থাকবে আর কেউ থাকবে অভাবে— এই ব্যাপারটাই রাজকন্যার পছন্দ নয়।

ষোলো বছর বয়েস হবার পর একদিন যশোধরা জানতে পারলেন কপিলাবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থর বিবাহের জন্য মেয়ে দেখা শুরু হয়েছে। দূর দূর থেকে বিবাহযোগ্যা সুন্দরী কন্যারা সিদ্ধার্থর সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষে কপিলাবস্তুতে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে সিদ্ধার্থের কথা যশোধরা শুনেছেন। দেবদত্ত তাঁর আত্মীয়পুত্র। দেবদত্তই তাকে সিদ্ধার্থর কথা বলেছেন। সে এক অপূর্ব কাহিনি। একদিন বনভোজন করার অভিপ্রায়ে দেবদত্ত উড়ন্ত এক ঝাঁক রাজহংসীর দিকে শরনিক্ষেপ করেছিল। দেবদত্তর সঙ্গী কপিলাবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থ। আহত হয়ে একটি পাখি মাটিতে পড়তেই দৌড়ে গেল দু'জনে। কিন্তু দেবদত্তের আগে সিদ্ধার্থ মাটি থেকে পাখিটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, 'এ পাখি আমার।' দেবদত্ত অবাক। তার বাণে আহত

রাজহংসী সিদ্ধার্থর হয় কী করে? কথাটা জিজ্ঞাসা করতেই সিদ্ধার্থ হেসে বলল, 'পাখির প্রাণ যে রক্ষা করে পাখি তারই হবে।' এ কাহিনি শোনার পর থেকে হৃদয়বান মানুষটার সঙ্গে দেখা করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন যশোধরা।

পরের দিনই কপিলাবস্তুর উদ্দেশে যাত্রা করলেন যশোধরা। তখন প্রাসাদে তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে বসে বিবাহেচ্ছু কন্যাদের সঙ্গে কথা বলছেন সিদ্ধার্থ। প্রাসাদরক্ষীকে জিজ্ঞাসা করে যশোধরা সেখানে পৌঁছে গেলেন। সিদ্ধার্থর সঙ্গে তার দৃষ্টিবিনিময় হলো। দু'জনেই চোখ ফেরাতে না পেরে পরস্পরের দিয়ে তাকিয়ে রইলেন। তারা কেউ কারোর অচেনা নন। জন্মজন্মান্তর থেকে তারা পরিচিত। এই পৃথিবীর বুকে কতবার যে তারা ঘর বেঁধেছেন আর কতবার যে সেই ঘর বিশ্বনির্মাণের মন্দির হয়ে গেছে তার বুঝি ইয়ত্তা নেই। কিছুক্ষণ পর যশোধরার আঙুলে আংটি পরিয়ে সিদ্ধার্থ তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। সানন্দে সম্মতি জানালেন যশোধরা।

বাড়ি ফিরে সুখবরটি দেওয়া মাত্র সুপ্পাবুদ্ধ মেয়েকে নিয়ে পড়লেন, 'এ তুমি কী করলে মা? তুমি কি জানো না রাজজ্যোতিষী ঘোষণা করেছেন সিদ্ধার্থ একদিন সন্ন্যাসী হয়ে যাবে?' যশোধরা শান্ত, স্বাভাবিক তার চোখে এক নতুন সকালের আলো। হেসে বললেন, 'জানি বাবা। কিন্তু সিদ্ধার্থ ছাড়া অন্য কোনও পুরুষকে আমি স্বামী ভাবতে পারি না। বহু জন্ম ধরে আমি ওর বাগ্‌দত্তা। এটাই আমাদের শেষ জন্ম। এরপর আর আমরা পৃথিবীতে আসব না।'

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে যশোধরার সম্বন্ধ অভিভাবকেরা ঠিক করেননি, তিনি নিজেই সিদ্ধার্থকে স্বামী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। একবার নয়, দু'বার সিদ্ধার্থ তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। যশোধরা স্বেচ্ছায় সেই প্রস্তাবে সম্মত হন। যশোধরা জানতেন সিদ্ধার্থ একদিন সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন। তিনি জানতেন, স্বর্গের চারজন দূত এই রাজপ্রসাদের জীবন সম্পর্কিত সিদ্ধার্থের মোহভঙ্গ করবেন। এতদ্‌সত্ত্বেও যশোধরা পিছিয়ে আসেননি। পিছিয়ে না আসার আরেকটা কারণ সিদ্ধার্থ ও যশোধরা একবার নয়, বহুবার এই পৃথিবীতে জন্মেছেন। সেইসব জন্মে যশোধরা সিদ্ধার্থকেই ভালোবেসেছেন, তাঁর স্ত্রী হয়েছেন, তাঁর সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। আবার সিদ্ধার্থ যখন বিশ্বের কল্যাণে গৃহত্যাগ করেছেন তখন যশোধরাও সর্বত্যাগী স্বামীর পথের সঙ্গী হয়েছেন। এই জন্মেও তার অন্যথা হবার কথা নয়। হয়ওনি।

যথাযথ আড়ম্বরের সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন হলো। বিবাহের পর তেরো বছর কেটে গেল আশাতিরিক্ত সুখ ও আনন্দে। দু'জনেই আধ্যাত্মিক মননের অধিকারী। দু'জনেই কাছেই প্রেম যত না শরীরের তার থেকে অনেক বেশি আত্মার। কিন্তু শুধু ভাবসম্মিলন দিয়ে তো সংসার হয় না! একদিন কালের নিয়মেই জন্ম হলো সিদ্ধার্থ ও যশোধরার ভালোবাসার সন্তান রাহুলের। নবজাত শিশুর আধো আধো কথায় এবং হাজারো দৌরাত্ম্যের মায়ায় ভরে গেল রাজপ্রাসাদ। খুশি সকলেই। শুধু পুত্রের পিতা আনন্দের সাগরে আকণ্ঠ ডুবে থেকেও অন্যমনস্ক। তাঁর মন বুঝি উধাও হয়েছে অন্য কোথাও। ইতিমধ্যে ঘটে গেছে একটা অদ্ভুত ঘটনা। পরপর কয়েকদিন ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন সিদ্ধার্থ। সঙ্গী সারথি ছন্দক। পথে সিদ্ধার্থ দেখেছেন জরা ও ব্যাধিগ্রস্ত দু'জনকে। একদিন দেখেছেন এক মৃত ব্যক্তিকে। আর একদিন দেখেছেন এক সন্ন্যাসীকে। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, সিদ্ধার্থর মনে হয়েছে সন্ন্যাসীই সংসারে একমাত্র সুখী। ত্যাগের পথই আনন্দের পথ। এমনতর উপলব্ধির পর থেকে সিদ্ধার্থ সারাক্ষণ অন্যমনস্ক থাকেন। যেন সাংসরিক ভোগসুখে তাঁর আর কোনও স্পৃহা নেই। ব্যাপারটা সকলেই চোখেই পড়ে। সকলেই কম-বেশি উদ্বিগ্ন হন। একমাত্র ব্যতিক্রম যশোধরা। তিনি জানেন এরপর কী হবে! হলোও তাই। একদিন গভীর রাতে স্ত্রী-পুত্র যখন নিদ্রামগ্ন ঠিক তখন সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করলেন---মহাভিনিষ্ক্রমণ। আলোর সন্ধানে শুরু হবে তাঁর চরৈবেতি। ভারতবর্ষের বুক থেকে জাতপাত কুসংস্কারের অন্ধকার মুছে দিতে হবে। অন্তরাত্মার নির্দেশ তিনি পেয়েছেন। এবার সেই নির্দেশ পালন করার পালা। পরেরদিন যশোধরা সব শুনলেন। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র ভেঙে পড়লেন না। বরং যখন শুনলেন সিদ্ধার্থ রাজকীয় পোশাক ত্যাগ করে গৈরিক বস্ত্র ধারণ করেছেন, তিনিও তাই করলেন। আজন্ম রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্যে বড়ো হয়ে ওঠা যশোধরা সানন্দে ত্যাগ করলেন মহামূল্য অলংকার। যখন তিনি শুনলেন সিদ্ধার্থ দিনে মাত্র একবার ভোজন করেন, তিনিও তাই শুরু করলেন। যখন শুনলেন সিদ্ধার্থ ভূমিতে শয়ন করেন, পরিত্যাগ করলেন প্রাসাদের আরামদায়ক শয্যা। এইভাবে, অন্তত সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের অব্যবহিত পরের দিনগুলিতে যশোধরা প্রসাদের ভেতরে থেকেই বিশ্বনিখিলের সাধক স্বামীর সাধনপথের সঙ্গী হয়েছেন। ঘর তাকে বন্দি করে রাখতে পারেনি।

রাজা শুদ্ধোদন এবং সুপ্পাবুদ্ধ দু'জনেই চেয়েছিলেন যশোধরা তাঁদের দুটি রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করুক। কিন্তু যশোধরা তা শুনবেন কেন? তিনি তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য জানেন। রাহুল ততদিনে বড়ো হয়ে গেছে। যশোধরা বুদ্ধের ভিক্ষুণী সঙ্ঘে যোগ দিলেন। নাম রাখা হলো বিম্বাদেবী। রাহুলও যোগ দিলেন সন্ন্যাসী সঙ্ঘে। যশোধরা ছিলেন বুদ্ধের সরাসরি দীক্ষিত ১৩ জন ভিক্ষুণীর অন্যতম। একদা যে মানুষটি তাঁর স্বামী ছিলেন, তাঁরই পায়ের কাছে বসে থাকেন ভিক্ষুণী। তাঁর মুখের দিকে তাকালে মনে হয় আলোর দিকে তাকিয়ে আছেন। যে আলো চোখের জানলা দিয়ে প্রবেশ করে মনের মধ্যে গিয়ে পড়ে। ভিক্ষুণীর মনে হয় ধন্য এ নারীজীবন। যে জীবন অন্ধকার পেরিয়ে আলোর সন্ধান দেয় তার সামনে নত হওয়াই শ্রেয়। তাই করলেন ভিক্ষুণী। একদিন রাতে বুদ্ধকে বললেন, 'আমার সময় শেষ। আপনার সঙ্গে এই পর্যন্ত আসারই কথা ছিল। এবার আমি শরীর ত্যাগ করতে চাই।' লক্ষ সূর্যের বিভায় উজ্জ্বল পুরুষ একথা শুনে মৃদু হাসলেন। ভিক্ষুণীর ইচ্ছায় বাধা দিলেন না। শেষবারের মতো বুদ্ধকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন ভিক্ষুণী। একবারও পিছন ফিরে দেখলেন না। সম্ভবত তার মনেও পড়ল না একদা তিনি যশোধরা ছিলেন। তিনি ভিক্ষুণী হয়ে জন্মেছিলেন আর ভিক্ষুণী হয়ে চলে গেলেন।

বর্ষায় ত্বকের সমস্যা মানসিক চাপ বাড়িয়ে দেয়

ডাঃ ইমরান ওয়ালি

বর্ষা মানেই বৃষ্টির ভ্রূকুটি, সঙ্গে আবার গরম। গরমের পরেই আসে বর্ষা। ফলে সেই আবহাওয়ার পরিবর্তন আমাদের ত্বকের পক্ষে খুব একটা সুখদায়ক হয় না। ফলে এই গরমের সময়টা থেকে শুরু করে একেবারে বর্ষার শেষ পর্যন্ত আমাদের ত্বককে নিয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করতেই হবে। কেননা আমাদের সৌন্দর্য সবটাই ওই ত্বকের চকচকে ভাবের ওপর নির্ভর করে। এই ত্বকের সামান্যতম বিচ্যুতিতে আমরা নাজেহাল হয়ে পড়ি। সে দাদ হোক বা চুলকানি, মাথার খুশকি হোক বা ত্বকের খসখসে ভাব। সবটাই আমাদের শরীরের ওপর যেমন চাপ তৈরি করে, তেমনি একটা মানসিক অস্বস্তিও তৈরি করে। এই পরিস্থিতি থেকে নিজেকে, মানে নিজের ত্বককে কীভাবে নিজেই রক্ষা করবেন, সেই সম্পর্কে দু'একটি কথা এবার বলি।

বর্ষায় আমাদের ত্বককে ঠিক রাখতে গেলে প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে, আমাদের খাদ্যাভাসে পরিবর্তন। কেননা শরীরে যাবতীয় অস্বস্তি দেখা দেয় এই খাবার থেকেই। এই সময়ে তেল-মশলা বেশি দেওয়া খাবার একটু এড়িয়ে চলতে বলব। একেবারে হালকা খাবার, যেটা সহজপাচ্য, সেই খাবার খেলে খুব ভালো। আর এর সঙ্গে লেবু ও সামান্য নুন দেওয়া জল খান। আমরা সাধারণ ভাষায় যাকে বলি পাতিলেবু দেওয়া জল বা লেবুজল। এই সময়ে ত্বককে রক্ষা করে টাটকা ফল। সে তরমুজ হোক বা মুসম্বি, খাবেন নিয়মিত।

এবার আসি আরেকটি জরুরি কথায়। বাইরে বেরোবার সময় হালকা রঙের শাড়ি বা জামাকাপড় পরার চেষ্টা করবেন। বাকি সময় সুতির কাপড় পরার চেষ্টা করবেন। রঙের ক্ষেত্রে একটা উদাহরণ দিই। সাদা ঘেঁষা বা অফ হোয়াইট, নীল বা হালকা নীল রঙের কাপড় পরা যেতে পারে। এই সময়েকালে আপনি স্নান করবেন নিয়মিত। নিজের

ত্বককে পরিষ্কার রাখবেন। দায়সারা স্নান একেবারেই করবেন না। আর যাদের পাউডারে অসুবিধা নেই তাঁরা পাউডার লাগাতে পারেন শরীরে।

আমি এই সময়কালে খাবারের মেনুতে কিছু বিশেষ খাবার রাখতে বলে থাকি। যেমন এই সময়ে শুক্তো খেলে আমাদের ত্বকের ক্ষেত্রে বেশ উপকারী হয়। ডাল রাখতে হবে, টক ডাল হলেও চলবে। এই সময়ের মরশুমি সবজির তরকারিও রাখবেন মেনুতে। টাটকা ফল খাবার কথাতো আগেই বলেছি। বাইরের খাবার একেবারে খেতে না করব এই সময়ে।

অনেকে বলেন আমাদের মুখ হচ্ছে আয়না। তাই মুখকে তরতাজা রাখতে হবে। বাজারে বেশ ভালো ফেস ওয়াশ পাওয়া যায়। সেগুলি ব্যবহার করবেন। এই বিষয়টা সবাই জানেন বলে বিশদে গেলাম না। মাথায় খুশকি বা অন্য সমস্যা দূর করার জন্য নিয়মিত শ্যাম্পু করতে হবে। একদিন ছাড়া একদিন করবার চেষ্টা করবেন। মাথায় যদি দেখেন ফুসকুড়ির মতো কিছু দেখা দিয়েছে, সেক্ষেত্রে আমার মতে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিয়ে লোশন লাগাতে পারেন। বাজারে ভালো অনেক লোশন পাওয়া যায়, সেগুলিও ব্যবহার করতে পারেন। এক্ষেত্রে একটু ঝুঁকি হতে পারে। কেননা আমাদের সবার ত্বকের চরিত্র এক নয়। বাইরের জিনিস কোনোটি সহজে গ্রহণ করতে পারে, কোনোটি আবার পারে না। সেক্ষেত্রে হিতে বিপরীত ফল দেখা দেবার সম্ভাবনা থেকেই যায়। এই সময়ে বিশেষ করে বর্ষার সময়ে বা প্যাচপ্যাচে গরমে একটা খুব বাজে চর্মরোগের দেখা মেলে। সেটা হলো দাদ। আমি বলব বাজার চলতি দাদের মলম না কিনে নিজের ত্বককে রক্ষা করতে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নেবার চেষ্টা করবেন।

গরম ও বর্ষাকালের জন্য একটি খুব সাধারণ টিপস মনে রাখবেন, যারা বাইরে বেরোন, তাঁরা চড়া মেক-আপ এই সময়ে করবেন না। হালকা মেক-আপ করবেন। মনে রাখবেন, আমরা যে মেক-আপ করার জন্য উপাদনগুলি ব্যবহার করে থাকি, সেগুলিতে অনেক রাসায়নিক পদার্থ থাকে। এই সময়ে সেগুলি থেকে প্রতিক্রিয়া বা রিঅ্যাকশন দেখা দিতে পারে। সেটা ত্বকের ক্ষতি করতে পারে। আর একটি টোটকা বলি। আপনি, আপনার মুখকে বা মুখের ত্বককে এই সময়ে ঠিক-ঠাক রাখার জন্য যতবার পারবেন পরিষ্কার জলে ধোবার চেষ্টা করবেন।

সমস্ত চিকিৎসক যে কথা বলে থাকেন, আমিও সেটাই বলব, নিজেকে হাইড্রেড রাখার চেষ্টা করবেন। যতটা পারবেন জল খাবেন। ত্বকের ওপর সানস্ক্রিন লোশন লাগিয়ে রাস্তায় বেরোবেন, তাহলে আপনার ত্বকে কালো ছোপ বা পুড়ে যাওয়া কালো ভাব থেকে রক্ষা করবে। ছাতা ব্যবহার করবেন। সে রোদ থেকে বাঁচতেই হোক বা বৃষ্টি থেকে বাঁচতে। বর্ষা বা গরমে বৃষ্টির মধ্যে বাইরে থেকে এসে পারলে গা-হাত-পা ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করুন।

এবারে সব শেষে বলি, ত্বককে খুব পরিষ্কার ও হাইড্রেড রাখলেই এই সময়ে ত্বকের নানা সমস্যা থেকে একেবারে রেহাই পাবেন।

অনুলিখন : স্বপন দাস

কেমব্রিজের ডাক পেয়েও দেশকে ভোলেননি সি.ভি. রমন

দীপক খাঁ

বিজ্ঞানীরা সাধারণত উদাসীন, অন্যমনস্ক এবং তাঁরা তাঁদের গবেষণার কাজে এত ব্যস্ত থাকেন যে, সংসারে কী ঘটল না ঘটল সেদিকে দৃষ্টি না থাকার কারণে তাঁদের সাংসারিক জীবন প্রায়শই সুখময় হয় না। এক্ষেত্রে বলা চলে এই বিজ্ঞানীর উন্নতির পিছনে স্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বরাবরই ছিল। যেমন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের গবেষণার ক্ষেত্রে প্রেরণা ছিলেন তাঁর স্ত্রী অবলা বসু, মেঘনাথ সাহার জীবনে সাফল্য তাঁর স্ত্রী রাধারানির উৎসাহে। বিজ্ঞানী সি.ভি. রমনের জীবনে লক্ষ্য করা যায় তাঁর যশ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি এসেছিল স্ত্রী লোকসুন্দরীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়।

সিভি রমন যখন চেন্নাইয়ের প্রেসিডেন্সি কলেজে এম.এ. পাঠরত তখন রামস্বামী শিবন নামে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। একদিন শিবনের বাড়িতে ঢোকবার মুখেই বীণার মধুর সুর রমনের কানে এল। শিবনকে রমন জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন বীণাবাদিনী হচ্ছেন শিবনের শ্যালিকা লোকসুন্দরী দেবী। প্রথম সাক্ষাতেই লোকসুন্দরী দেবীকে ভালো লেগে যায় রমনের। যদিও বিবাহে রমনের মায়ের প্রথমে আপত্তি ছিল। কারণ লোকসুন্দরী ব্রাহ্মণ কন্যা হলেও পালটি ঘরের নয়। তবুও রমনের জেদের জন্য মা এই বিবাহে মত দেন। ১৯০৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে রমন সহকারী অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের পদ নিয়ে কলকাতায় আসেন। মাইনে চারশো টাকা, তার মধ্যে বিবাহ ভাতাও ছিল, যেটি কেবলমাত্র বিবাহিত অফিসারদের দেওয়া হতো। এ বিষয়ে লোকসুন্দরী দেবী রসিকতা করেন যে, এই বিবাহভাতা পাবার লোভেই তিনি লোকসুন্দরীকে বিয়ে করেছেন।

লোকসুন্দরী রমনের প্রাত্যহিক রুটিন নিজেই পরিচালনা করতেন। তিনি স্বামীর দিনচর্যা সম্পর্কে বলেছেন : ভোর পাঁচটায় রমন কালটিভেশানে যান। পৌনে দশটায় সেখান থেকে ফিরে স্নান করেন, কোনোরকমে ভাত খেয়ে গাড়ি নিয়ে অফিসে যান। বিকেল পাঁচটায় অফিস থেকে সোজা কালটিভেশনে চলে আসেন। বাড়ি ফিরতে সেই রাত সাড়ে ৯টা থেকে ১০টা। রবিবার সারাদিন কাটে কালটিভেশনে। একটি তরুণী বধূর পক্ষে খুব একটা চিত্তাকর্ষক জীবন একে নিশ্চয়ই বলা চলে না। শেষের বাক্যটি শুনে মনে হতে পারে লোকসুন্দরীর সাংসারিক জীবন সুখের নয়, কিন্তু রমনের একজন ছাত্র ভাগবন্তম লোকসুন্দরী সম্পর্কে বলেন : অধ্যাপক রমন যাতে ভালোভাবে এবং অব্যহত ভাবে নিজের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন সেটা দেখাই ছিল লোকসুন্দরী দেবীর জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। স্বামীর থেকে স্বতন্ত্র ভাবে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বকে তিনি বড়ো একটা প্রকাশ পেতে দিতেন না। রমনের গবেষণার কাজে কখনও স্ত্রী হস্তক্ষেপ করেননি। ভালোমন্দ বোঝার ক্ষমতা ছিল লোকসুন্দরীর। তাই কোনো ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য লোকসুন্দরীর সঙ্গে রমন পরামর্শ করতেন। লোকসুন্দরীর সঠিক পরামর্শগুলি রমনের বৈজ্ঞানিক জীবনকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। যার সর্বশেষ পরিণতি হলো তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি। রমনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে থাকবেন এটাই ছিল লোকসুন্দরীর অন্তিম ইচ্ছা। এটাই হলো ভারতীয় নারীর আদর্শ। লোকসুন্দরীর কাছে এই নিষ্ঠাই ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। তাই বলে রমনের জীবনে কি উদাসীনতা ও মনোবেদনার কোনো কিছু ছিল না? দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে অনেকবার। একদিন কালটিভেশনে কাজ করতে করতে অনেক রাত্রি হয়ে যাওয়ায় শেষ রাতে বাড়ি ফিরে দেখেন তাঁর স্ত্রী অভুক্ত রয়েছেন। তিনি তো চটে লাল, এমন ভাবে চিৎকার চেঁচামেচি করতে লাগলেন যে অবশেষে তাঁর

প্রতিবেশী গোবিন্দ রাজ মুদালিয়ারকে ছুটে আসতে হয় কাজ পাগল লোকটিকে শান্ত করার জন্য।

তাঁর অন্যমনস্কতার আরও একটি ঘটনার কথা এখানে বলা যায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক রূপে। একবার রমন ট্রেনে করে বারাণসী যাচ্ছিলেন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পরীক্ষা নিতে। ট্রেনে একজন রেলের উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সকালে ট্রেন থেকে নেমে গেটে আসতেই টিকিট পরীক্ষক টিকিট চাইলেন। রমন টিকিটটি পকেট হাতড়ে কোথাও পেলেন না। টিকিট পরীক্ষক রমনকে অনেক টাকা জরিমানা করলেন। কিন্তু রেলের ওই উচ্চপদস্থ ব্যক্তি টিকিট পরীক্ষককে তাঁর পরিচয় দিয়ে চেকারকে বললেন অধ্যাপককে গেটের বাইরে পার করে দিতে এবং রমনকে বললেন— আপনার টিকিট না থাকলে কখনই আপনার নামে বার্থ রিজার্ভেশন হতো না। এই ভাবে সেদিন টিকিট হারানোর ঝামেলা থেকে মুক্ত হলেন। বৈজ্ঞানিকদের এই রকম অন্যমনস্কতার কথা শোনা যায়।

রমনের জীবনযাত্রা ছিল খুব সাদাসিধে। ১৯০৭ সালে ফিন্যান্স সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করে কলকাতায় অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল পদে যোগ দিতে চেন্নাই মেলে আসছেন। তাঁকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য ফুলের মালা নিয়ে হাওড়া স্টেশনে অফিসের কর্মচারীরা অপেক্ষা করছেন। তাঁরা ভেবেছিলেন উচ্চপদস্থ অফিসার একটু বয়স্ক লোক হবেন। যথাসময়ে ট্রেন এল— সবচেয়ে শেষে দেখা গেল একজন দক্ষিণ ভারতীয় যুবককে। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করা হলো— সি.ভি. রমনের আসার কথা ছিল— তাঁর কোনো সন্ধান দিতে পারেন কিনা? তিনি বললেন, আমিই সি.ভি. রমন। সকলে বিস্মিত হলেন, এই বালক একজন উচ্চপদস্থ অফিসার! কলকাতায় যখন কর্মরত ছিলেন, সে-সময় একবার একজন কর্মচারীকে তাঁর কাজের অবহেলার জন্য রামন বরখাস্ত করেন। অমৃতবাজার পত্রিকায় বরখাস্ত কর্মচারীর পক্ষ সমর্থন করে এই বালক অফিসারকে ধিক্কার জানানো হয়। যদিও পরে রমনের বড়ো কর্তা তাঁর সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে মেনে নেয়।

রমন কতখানি স্বাধীনচেতা ছিলেন, তার একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। একবার রমন বড়োকর্তা অর্থাৎ অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের একটি আদেশ অমান্য করায় সাহেব তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হন। তিনি বলেন, শুনুন মি. রমন, এই লাল কালির বোতল দেখিয়ে যদি আমি বলি যে, বোতলে কালো কালি রয়েছে, তাহলে আপনার উচিত বলা, হ্যাঁ মহাশয় এটা কালো কালি, বুঝেছেন?

রমন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ছিলেন— এক্ষেত্রে আমার মত হচ্ছে আপনি অন্ধ, নয়তো পাগল, কিংবা দুই-ই। এর অল্প দিন পরে রমন এই পদে ইস্তফা দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক পদে যোগ দেন। তিনি দেশকে খুব ভালোবাসতেন। জীবনে বহুবার বিদেশ থেকে গবেষণা করার সুযোগ পেয়েও কোনোটাই গ্রহণ করেননি। ১৯৩০ সালে তাঁকে যখন নোবেল পুরস্কারের সংবাদ জানানো হয়, তখন তিনি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে বলেছিলেন, 'বন্দে মাতরম্'। স্বদেশ প্রীতি কত প্রগাঢ় হলে এমন তিনি করতে পারেন! এ সম্পর্কে ড. আর.এস. সুন্দর বলেন :

Raman's simplicity, dedication to science, teaching ability, personal sacrifice and shinning publicity and monetary benefits, captured the attention of the cambridge University in England and Raman was offered a job in the University on very attractive salary. Raman, being aware of the freedom struggle that was in progress during that time, declined the grand offer of the cambridge University much to the astonishment and dis-appointment of the University and the scientist world. He remained an Indian Saint in having lived till the last with the South Indian Tradition.

রমনের দুই পুত্র চন্দ্রশেখর ও রাধাকৃষ্ণন। রাধাকৃষ্ণন রমন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ হন। তিনি একজন জ্যোতিপদার্থ বিজ্ঞানী ছিলেন। রমনের মধ্যে প্রচণ্ড জাত্যাভিমান ছিল। একবার ম্যাক্সবর্নকে রেগে বলেছিলেন, 'তুমি কী ভাবো? তুমি জার্মান ইহুদি হতে পার, তবে তুমি ভুলে যেও না আমিও দক্ষিণী বামুন।' তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। অবশ্য আচার বিচার পালন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। বহুবার বিদেশ গিয়েছেন, বিদেশি বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন কিন্তু কখনও মদ স্পর্শ করতেন না। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন। তিনি যা জানতেন না তা অকপটে স্বীকার করে নিতেন, কখনও জানার ভান করতেন না। একবার ইন্সটিটিউটে বক্তৃতা দিচ্ছেন ড. হোমিভাবা, সেই সময়কার একজন উঠতি গবেষক। অনেকক্ষণ ধরে বোর্ডে চক দিয়ে নানা সমীকরণ লিখে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছিলেন। বক্তৃতা শেষ করে ড. ভাবা প্রথম সারিতে বসা গুরুর দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। রমন নিজের ডান হাতটি একবার কপালে ছুঁইয়ে মাথার উপর দিয়ে চালিয়ে ছাত্রকে বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর কিছুই বোধগম্য হয়নি। অতবড়ো বিজ্ঞানী হয়েও ওই বিষয়ে তাঁর কোনো জ্ঞান নেই, সর্বসমক্ষে একথা বলতে তিনি দ্বিধা করলেন না। তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল প্রখর। ১৯২৫ সালে স্যার আশুতোষকে বলেন, 'আমাকে কাজ করবার সুযোগ করে দিন। পাঁচ বছরের মধ্যে আমি নোবেল পুরস্কার এনে দেব।'

একথা একদিন বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। এই সদালাপী, ছাত্রবৎসল শিক্ষক আশি বছরেও নবীন যুবকদের উৎসাহে কাজ করে গেছেন। তিনি নিয়মিত ভাবে নেচার, ফিজিক্যাল রিভিউ, ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় লিখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর রাতে তাঁর স্ত্রী তাঁকে ঈশ্বরের নাম নিতে বলেন। মৃত্যু পথযাত্রী হয়েও তিনি বললেন, 'আমি শুধু মানুষের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করি' এবং মহাত্মা যিশুখ্রিস্ট ও বুদ্ধের কথা বলতে থাকলেন। পরিশেষে বললেন— 'তোমার কাছে আমার একটাই অনুরোধ, আমার মৃত্যুর পর আমাকে শুধু পরিচ্ছন্ন অনাড়ম্বর ভাবে সমাহিত করার ব্যবস্থা করো।'

১৯৭০ সালের ২১ নভেম্বর সকালে সি.ভি. রমনের জীবনাবসান হয়। তিনি যেদিনটিতে 'রমন এফেক্ট' আবিষ্কার করেছিলেন সেই ২৮ ফেব্রুয়ারিকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য দিনটিকে 'জাতীয় বিজ্ঞান দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। □

গুরুভায়ুর মন্দিরের মাহাত্ম্য

কৌশিক রায়

মন্দিরময় দক্ষিণ ভারতে প্রসিদ্ধ দেবালয় বলতে আমরা মাদুরাইয়ের মীনাক্ষী মন্দির, হ্যালেবিদের চেন্নাকেশব মন্দির, মহাবলীপুরমের মন্দিরকে জানি। তবে, কেরলের ত্রিসূর জেলার গুরুভায়ুর-এ অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরটি তার স্থাপত্য এবং ধর্মীয় গরিমাতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান যে পেতে পারে— সে সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ নেই। এই গুরুভায়ুর মন্দিরে মুরারীমোহন শ্রীবিষ্ণুকে দুষ্টু, ননীচোরা, নন্দের নন্দন, যশোদাদুলাল, বালগোপাল রূপে পূজা করা হয়।

১৬৩৮ সালে গুরুভায়ুর মন্দিরের স্থাপনা হয়। তবে এই দেবালয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ তার আগে কয়েকশো বছর ধরে আছে বলে ইতিহাসবিদদের ধারণা। পঞ্চদশ শতকে মালয়ালম ভাষাতে রচিত ধর্মীয় আলেখ্য 'কোকাসন্দেশ'-এ এই মন্দিরটিকে 'কুরুভায়ুর' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিংবদন্তী যে, এই মন্দিরের বিগ্রহকে নাকি শ্রীকৃষ্ণ নিজেই দ্বারকাতে উপাসনা করতেন। শ্রীবিষ্ণু যখন আবার বৈকুণ্ঠনিবাসী হলেন, তাঁর নির্দেশমতো ওই বিগ্রহের পূজা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন দেবগুরু বৃহস্পতি ও বায়ুদেবতা পবন। এই মন্দির প্রাঙ্গণেই তপস্যা করতে করতে গিয়ে ব্রজবল্লভের মূর্তিটি স্থাপন করেন দেবাদিদেব মহাদেব। এই বিগ্রহের উপাসনা এই মন্দিরে এসে করেন স্বয়ং পরশুরাম ও দেবী পার্বতী। ষোড়শ শতকের কেরলের সামাজিক টানাপোড়েনের সাক্ষী এই গুরুভায়ুর দেবালয়। কিছু দরিদ্র, 'নাম্বুদিরি' সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে গীতা পাঠের পাশাপাশি শ্রীকৃষ্ণের হোম ও আরতি করতেন। এই ব্রাহ্মণদেরই মধ্যে একজন ছিলেন পুন্থানাম।

১৫৪৭ সালে কেরলের কিজাত্থুর গ্রামে জন্ম হয়েছিল পুন্থানামের। মাল্লাপ্পুরম জেলার পেরিন্থালাম্মান্না নামক অঞ্চলের নিকটবর্তী এই গ্রামটি। গুরুভায়ুর মন্দিরের অন্যতম প্রধান সেবক রূপে বিনীত, মানবতাবাদী, শিবজ্ঞানে জীবদর্শনকারী পুন্থানামকে প্রকৃত বৈষ্ণবরা চিরকালই মনে রাখবেন। পুন্থানামের আসল নাম অবশ্য জানা যায়নি। শৈশবকাল থেকেই তিনি তাঁর কুলদেবতা থিরুমনধানকান্নু ভগবতীর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। অঙ্গদীপ্পুরমে এই কুলদেবতার মন্দিরটি পুন্থানামই চালাতেন। ক্রমশই ভগবতীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের রূপকে দর্শন করতে শুরু করেন পুন্থানাম। প্রতি মাসেই ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তিনি গুরুভায়ুর মন্দিরে যেতেন। তাঁর মনে একটাই দুঃখ ছিল। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। শেষ পর্যন্ত একটি পুত্রসন্তানের জনক হলেন পুন্থানাম। তবুও, বিধি তাঁর সঙ্গে নিষ্ঠুরতা করলো। অন্নপ্রাশনের সময় অতিথি অভ্যাগতদের ফেলে যাওয়া কাপড় এবং উপহার সামগ্রীর দ্বারা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় পুন্থানামের এই শিশুপুত্রটি। শোকবিহ্বল পুন্থানাম রচনা করলেন 'জ্ঞানাপ্পানা' বা 'প্রজ্ঞাসংগীত'। এই প্রজ্ঞাসংগীতের মধ্যে আরও ব্যাপক, আরও গভীর হয়ে দেখা দিল বৈদিক দর্শন, অতি সরল ও জনবোধ্য ভাষার মধ্য দিয়ে। তবে দরিদ্র পুন্থানামের দ্বারা, মালয়ালম ভাষায় রচিত এই জ্ঞানগর্ভী বাণীকে উচ্চবংশজাত, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা ঘৃণা করতে শুরু করলেন।

পুন্থানামের মালয়ালম ভাষাতে রচিত ও উচ্চারিত ভাগবতশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন সংস্কৃত ভাষার কবি মেল্পুথুর নারায়ণ ভট্টাথিরি। শোনা যায়, পুন্থানামের 'শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতম' গ্রন্থটি পাঠ করার পর তাঁর বিষ্ণুদর্শন হয় এবং গেঁটেবাতের অসুখ ভালো হয়ে যায়। গুরুভায়ুর মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের জন্য মালা গাঁথতো মঞ্জুলা নামক এক দরিদ্র, অল্পবয়েসি মেয়ে। একদিন মায়ের সঙ্গে অনেক দূরে যাওয়ার জন্য গুরুভায়ুর মন্দিরে পৌঁছোতে দেরি হয়ে যায় মঞ্জুলার। শ্রীকৃষ্ণকে মাল্যদান করতে না পারার জন্য কাঁদতে থাকে মঞ্জুলা। তখন পুন্থানাম মঞ্জুলাকে মন্দিরের পূর্ব প্রবেশদ্বারের কাছে পিপুল গাছে মাল্যদান করতে উপদেশ দেন। পরেরদিন ওই মন্দিরের পুরোহিত বিগ্রহের শরীর থেকে মালা খুলে ফেলতে পারেননি। ওই মালা বিগ্রহের শরীর থেকে খুলে ফেলতে হলে তাঁকে মঞ্জুলার মতো ভক্ত এবং নিবেদিত প্রাণ হতে হবে। তখন পুরোহিত মঞ্জুলার মতো ভক্তি দেখালে মালাটি কৃষ্ণ বিগ্রহ থেকে খুলে আসে। মঞ্জুলার স্মৃতিধন্য ওই পিপুল গাছটি এখনও গুরুভায়ুর কৃষ্ণদেউলে বিদ্যমান। মন্দিরটির যেখানে পুন্থানাম ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দর্শন পেয়েছিলেন সেখানে একটি ছোটো কুটির নির্মাণ করা হয়েছে। সেই পুন্থানাম ইল্লম দেখতে এখন বহু দর্শনার্থী আসেন। গুরুভায়ুর মন্দিরের প্রবেশদ্বারে পুন্থানামের মূর্তি শোভা পাচ্ছে।

শাস্ত্রমতে গোমাতা হিন্দুদের সাত মাতার অন্যতম

দীপক কুমার পর্বত

'মা' একটি পবিত্র শব্দ। যিনি আমাদের গর্ভে ধারণ করে জন্মদান করে পৃথিবীর আলো দেখান। প্রচলিত একটি বিখ্যাত প্রবাদ 'যেহেতু ঈশ্বর সর্বত্র উপস্থিত থাকতে পারেন না সেই কারণে তিনি একজন মা সৃষ্টি করেছেন'। তাহলে 'মা' হলো আমাদের কাছে ঈশ্বর। হিন্দুরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে থাকে। আমরা গোরুর দুগ্ধ পান করি কিন্তু গোমাংস সনাতন ধর্মে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ কেন? শাস্ত্রগ্রন্থে গোমাতা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। পবিত্র বেদে সাত রকম মাতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যথা— (১) বেদ মাতা, (২) ধরিত্রী মাতা, (৩) গোমাতা, (৪) রানি মাতা, (৫) ব্রাহ্মণ মাতা, (৬) গুরুপত্নী মাতা, (৭) নিজের জন্মদাত্রী মাতা।

আমরা আমাদের জন্মদাত্রী মাতার দুগ্ধ পান করে বড়ো হয়ে থাকি কিন্তু সেই মাতার মাংস ভক্ষণ কল্পনা করতে পারি না। শাস্ত্র মতে ৭ মাতার মধ্যে গোমাতা এক মাতা। সেই মাতার আমরা দুগ্ধ পান করি। হিন্দুদের কাছে সেই মাতার মাংস ভক্ষণ কল্পনাতীত। কোনওদিনই ভক্ষণ করতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালের লীলা বিলাস এই গোমাতাদের সঙ্গে করেছিলেন।

পবিত্র বেদে গোহত্যা এবং গোমাংস ভক্ষণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঋকবেদে বলা হয়েছে গোমাতাকে হত্যা নয়, রক্ষা করাই আমাদের ধর্ম। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, 'যে ব্যক্তি গোমাংস ভক্ষণ করে এবং যে ব্যক্তি ঘাতককে গো হত্যার অনুমতি দেয়, তাদের সকলকেই সেই নিহত গোরুর লোম পরিমিত সময় নরকে নিমগ্ন থাকতে হয়।'

গো হত্যা ও গোমাংস ভক্ষণের নিষিদ্ধতায় কিছু শাস্ত্রীয় সূত্র নিম্নরূপ :

(১) যজুর্বেদের ১৩.৪৯ নং অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা আছে, গোরু আমাদের মাতৃতুল্য অর্থাৎ গোহত্যা, মাতৃহত্যার সমান। অর্থাৎ গোমাতা ও গোপুত্রদের রক্ষা করতে হবে। হত্যা নিষিদ্ধ। (২) ঋকবেদের ১.১৬৪ নং অনুচ্ছেদে গোমাতা অঘ্না বলা হয়েছে, তাই তাকে হত্যা করা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। তাকে জল, সবুজ ঘাস পাতা, খড়, বিচালি প্রভৃতি গোগ্রাস দিয়ে সমৃদ্ধ করতে হবে। যার ফলস্বরূপ জ্ঞান, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ সম্ভব পর হবে। (৩) ঋকবেদের ৮.১০১ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে গোমাতা নির্দোষ অদিতি প্রাণী, যার শরীরে সহস্র দেবতার বাস রয়েছে। সেই গোমাতাকে হত্যা করা বা খণ্ডিত করা সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ ও অবৈধ। (৪) অথর্ব বেদের ৩.৩০ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে গোমাতাকে ভালোবাসতে হবে এবং গোহত্যার মহাপাপ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। তার সঙ্গে গোমাতাদের অপত্যগুলোকে আদর করে প্রতিপালিত করে তোলা মানুষের আবশ্যিক কর্তব্য হিসেবে পরিগণিত।

সনাতন ধর্মে কোনো স্থানে মহিষ হত্যা ব তার মাংস ভক্ষণের কথা উল্লেখ নেই। আগে কোনো কোনো জমিদার বাড়ি অথবা বারোয়ারি দুর্গাপূজাতে দেবতার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য প্রদানের জন্য মহিষ বলিদানের নিদর্শন পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এই প্রথাটি সমাজে কুসংস্কার রূপে পরিগণিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধে উল্লেখ আছে 'পাঁঠার লোভে গঙ্গা পুজো' অর্থাৎ তৎকালীন সমাজের বিধানদাতা দিলেন ব্রাহ্মণ সমাজ, তখন তাদের সমাজের নিদান ছিল মাংস ভক্ষণ ব্রাহ্মণ ও বিরোধী ক্রিয়াকলাপ। তাদের বিধান ছিল সমাজের নিম্ন জাতির লোকেরা অর্থাৎ মুচি, মেথর, ডোম, শুঁড়ি, বাগদি, তেওর প্রভৃতি জাতি মাংস ভক্ষণ করে। কিন্তু ব্রাহ্মণদেরও মাংস ভক্ষণের লালসা জাগ্রত হয়েছিল। তখন তাদের সেই লালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ঘুরপথে মাংস ভক্ষণের জন্য পাঁঠাবলির প্রচলন করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলিপ্রদত্ত সেই পাঁঠার মাংস ভক্ষণ করে নিজেদের আত্মতৃপ্তি দান করতো। সর্বপ্রথম গঙ্গাপুজোতে এই পাঁঠার বলি প্রচলন হয়। কোনো পুরাণ, বেদ ও প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্রে ছাগল মাতৃরূপে বর্ণিত হয়নি। সুতরাং বেদ ও পুরাণ মতে ৭ মাতার মেধ্যে গো অর্থাৎ গোরু মাতৃরূপে বর্ণিত হলেও মহিষ কিংবা ছাগল মাতা নয়। □

উত্তরপ্রদেশে জাতপাতের ফর্মূলা উলটে দিয়েছে বিজেপি

দুর্গাপদ ঘোষ

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিজেপি তথা মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের ঐতিহাসিক জয় ছাড়াও নানা দিক থেকে এই নির্বাচন ছিল বৈচিত্র্যময়। কোথাও কোথাও যেমন আগের ইতিহাস এবং কল্পিত ধারণা (মিথ) ভেঙেছে, তেমনি কোথাও কোথাও নতুন নজির সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে এমন অনেক ঘটনা আছে যার সবকিছু একসঙ্গে, এক জায়গায় সংকলন করে প্রতিবেদন তুলে ধরা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। তাছাড়া পত্রিকায় পরিসরের সংকুলানও একটা বড়ো বিষয়। এইসব দিকে লক্ষ্য রেখে এবারের প্রতিবেদনে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কিছু তথ্য সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেশন করে একটা কোলাজ সামনে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এখানে বিজেপি বলতে বোঝানো হয়েছে বিজেপি জোটকে। যার মধ্যে ১২ আসনে জেতা আপনা দল (সোনেলাল বা এস) এবং ৬ আসনে জেতা নিষাদ (নির্বল ইন্ডিয়ান শোষিত হামারা আম দল) পার্টিও রয়েছে। অনুরূপভাবে এসপি বলতে আরএলডি এবং এসবিএসপি (সুহেলদেব ভারতীয় সমাজ পার্টি)-কে নিয়ে গঠিত হওয়া জোটের কথা বলা হয়েছে। শেষোক্ত দল পেয়েছে ৩টে আসন। বিজেপির একার আসন ২৫৫ এবং এসপি-র একার আসন হলো ১১১টা।

সাইকেল গড়ে পদ্মের আলপনা : নির্বাচনী প্রতীক বাইসাইকেলের দল সমাজবাদী পার্টির (এস পি) সভাপতি অখিলেশ সিংহ যাদব যখন মইনপুরী জেলার করহল আসনে দাঁড়িয়েছিলেন তখন সম্ভবত ধারণাও করতে পারেননি যে এসপি-র প্রথাগত গড় হিসেবে চিহ্নিত এই জেলায় জোরালো থাবা বসিয়ে বিজেপি দু' দুটো আসন ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। করহলে অখিলেশ নিজে প্রায় ৮৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতলেও জেলার দুই গুরুত্বপূর্ণ আসন ভানগাঁও এবং খোদ মইনপুরী সদরে পদ্মফুলের আলপনা সাজিয়েছে বিজেপি। সাইকেল থেকে ছিটকে পড়েছেন 'শিরপে লাল টোপি' ওয়ালা অখিলেশের দুই প্রার্থী। করহল ছাড়া জেলায় আর একটা আসন কিষনি-কে কোনোরকমে ধরে রাখাতে সক্ষম হয়েছে এসপি। মইনপুরী এতদিন সমাজবাদী পার্টির দুর্গ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছিল। ২০১৭ সালের গেরুয়া ঝড়েও বিজেপি এখানে কামড় বসাতে পারেনি। এসপি-র প্রতিষ্ঠাতা, যাঁকে তাঁর দলের সমর্থকরা 'নেতাজী' বলে সমীহ করে থাকেন সেই মুলায়ম সিং যাদব মইনপুরী লোকসভা আসন থেকে নির্বাচিত সাংসদ। এহেন একটা জেলায় মোট ৪টে বিধানসভা আসনের মধ্যে বিজেপি একেবারে আধাআধি ভাগ বসিয়ে দু' দুটো আসন ছিনিয়ে নেবে এটা রাজনৈতিক পণ্ডিতদেরও ধারণা ছিল না। আরও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, মইনপুরী-সহ এটাওয়া, আউরাইয়া, কনৌজ, ফারুকাবাদ, ফিরোজবাদ, সম্ভল ও বদাউন জেলাগুলো মিলে বিধানসভায় মোট ৩২টা আসন আছে।

জেলাগুলিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় রয়েছেন মুসলমান ও যাদব ভোটার। এই সূত্রে এসপি নেতারা দীর্ঘদিন যাবৎ 'মুসলমান-যাদব' (এম-ওয়াই) ফর্মূলা চালিয়ে এসেছেন। এবার সেই রসায়নের টেস্টটিউব উলটে দিয়েছে সভাপতি স্বতন্ত্রদেব সিংহ এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বাধীন বিজেপি। সমাজবাদী পার্টির ঝুলিতে মাত্র ৯টা আসন পড়েছে। বাকি ২৩টি দখল করেছে বিজেপি। এটাওয়ার যশবন্তনগর আসনটি এসপির টিকিটে মুলায়মের ভাই শিবপাল যাদব এবার নিয়ে লাগাতার ৬ বার জিতলেও এখন তিনি বিজেপিতে যাবো যাবো করছেন। পাশাপাশি এটাওয়া সদর আসনটি বিজেপি দখল করে নিয়েছে। সেই সঙ্গে কনৌজ ও আউরিয়া জেলার সব আসনই এখন গেরুয়ার দখলে। এছাড়া প্রয়াগরাজ এলাহাবাদ জেলার কারজানা আসনটি ছিনিয়ে নিয়ে একটা বহু বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে বিজেপির জোটসঙ্গী নিষাদ পার্টি। বিগত ৪৮ বছর ধরে আসনটি এসপির দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসেবে চিহ্নিত ছিল। এখানে পীযুষ রঞ্জন নিষাদ ৯ হাজার ৫৮৪ ভোটে পরাজিত করেছেন দুঁদে নেতা কানোয়ার রেবতীরমন সিংয়ের ছেলে উজ্জ্বলকে। কারজানায় বিজেপি-জোটের এটাই প্রথম জয়।

৭১ বছর পর : বিজেপির জয়ের মুকুটে নতুন পালক যুক্ত করেছে উন্নাও জেলার পূর্বা আসন। ১৯৫১ সালে আসনটি গঠিত হবার পর থেকে ২০২২-এর আগে পর্যন্ত ভারতীয় জনসঙ্ঘ কিংবা বিজেপি এখানে জিততে পারেনি। ৭২ বছর আগে কংগ্রেসের রামদীন সিং প্রথম জয়ী হয়েছিলেন। ১৯৯১ পর্যন্ত ছিল কংগ্রেসি গড়। ১৯৯৬ থেকে চলে যায় এসপি-র দখলে। সেই থেকে আসনটি এসপি-র নিশ্চিত ঘাঁটি বলে চিহ্নিত হয়ে আসছিল। এবার সেই মিথ ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন বিজেপির অনিল কুমার সিং। জিতেছেন ২৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে।

জমানত জব্দের পাহাড় : নির্বাচন কমিশনের তথ্য মোতাবেক এবার উত্তরপ্রদেশে জমানত জব্দের রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখযোগ্য উদাহরণ তৈরি হয়েছে

প্রয়াগরাজ ক্ষেত্রেও। এখানে ২২ আসনের জন্য মোট ৩০০ জন প্রার্থী হয়েছিলেন। ২৫৫ জনেরই জমানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। হার ৮৫ শতাংশ। কেবল এই জেলা নয়। গোটা রাজ্যের চিত্রও প্রায় একই রকম। নির্দল প্রার্থীদের কথা বাদ দিলেও কেবল বিজেপি এবং এসপি ছাড়া কংগ্রেস, এমনকী মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টির (বিএসপি) মতো বড়ো পার্টিরও বহু প্রার্থী তাঁদের জমানত বাঁচাতে পারেননি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুসারে কেউ বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হতে চাইলে ১০ হাজার টাকা জমা করতে হয়। তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজতির প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে জমা রাখতে হয় ৫ হাজার টাকা। সেই টাকা ফেরত পেতে হলে প্রদত্ত মোট ভোটের ১৬.৬৭ শতাংশ বা এক-ষষ্ঠাংশ ভোট পেতে হয়। না হলে জমা করা টাকা জব্দ বা বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। এবার উত্তরপ্রদেশে গড়ে প্রায় ৮৫ শতাংশ প্রার্থী নিজেদের পক্ষে সেই ভোট জোগাড় করতে পারেননি।

উলটে গেছে জাতির তাস : এসপি নেতা অখিলেশ যাদব-সহ প্রায় সমস্ত বিজেপি-বিরোধী দল মুসলমান ছাড়াও ওবিসি ভোটারদেরও নিজেদের পক্ষে টেনে নেবার কৌশলী চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু তাদের সেই জাতিবাদী পাশার দান উলটে গেছে। রাজ্যে মোট ভোটারদের৪০ শতাংশ হলো ওবিসি ক্যাটাগরিভুক্ত। এদিকে নজর রেখে প্রধান দলগুলো মোট ৪০৩ আসনে মধ্যে ১২০ থেকে ১৫০ জন করে ওবিসি প্রার্থীকে মাঠে নামিয়েছিল। ফলাফলে দেখা যাচ্ছে ওবিসি ভোটাররা প্রায় একচেটিয়া ভাবে বিজেপিকে বেছে নিয়েছেন। এমনকী যে যাদবদের প্রথাগতভাবে সমাজবাদী পার্টির কট্টর সমর্থক মনে করা হয়ে থাকে তাদের গড়েও বিজেপি চুটিয়ে জিতেছে। এসপি-র 'এম-ওয়াই' ফ্যাক্টরের 'এম' কাজে দিলেও 'ওয়াই' ফ্যাক্টর তেমনভাবে ফলদায়ক হয়নি। ২০১৭ সালেও ওবিসি-রা বিজেপিকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু এবার বিজেপির ওবিসি প্রার্থীদের জয়ের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। অনুমান, ওবিসি-দের ৬০ শতংশই সমর্থন করেছেন মোদী-যোগী (এম-ওয়াই)-র দলকে। অর্থাৎ সমাজবাদী পার্টির এম-ওয়াই ফ্যাক্টর তেমন কাজে না দিলেও বিজেপির ক্ষেত্রে তাদের এম-ওয়াই ফ্যাক্টর কার্যকরী হয়েছে।

এসপি-র 'এম' ফ্যাক্টর : উত্তরপ্রদেশে মোট জনসংখ্যার ১৮.৮৭ শতাংশ মুসলমান। রাজ্য বিধানসভায় প্রায় ৭০টা আসন আছে যেখানে তাঁদের হার গড়ে ৩০ শতাংশ। বিশেষ করে পশ্চিম ইউপি-তে। এদের তোষামোদ করতে প্রায় সব দলই দশ পা আগ বাড়িয়ে থাকে। একচেটিয়া মুসলমান ভোট দখল করার জন্য ১৯৮৯-৯০ সালে মুলায়ম সরকার নির্বিচারে রামভক্ত করসেবকদের গণহত্যা করেছিল। সমাজবাদী পার্টির এই 'এম' ফ্যাক্টর প্রায় প্রত্যেক নির্বাচনেই তাদের পক্ষে কাজ করে আসছে। এবারও ব্যতিক্রম হয়নি। পর্যবেক্ষক মহলের মতে এবার প্রায় ৯০ শতাংশ মুসলমান একতরফাভাবে এসপি-কে ভোট দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগীর কেন্দ্র গোরক্ষপুর শহর কেন্দ্রের একটা বুথে প্রায় যে সাড়ে ন'শো ভোট পড়েছে তার মধ্যে মাত্র ৯টা ভোট পড়েছে বিজেপির পক্ষে। যোগী সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের যাবতীয় সুবিধা লাভ করলেও সেখানকার মুসলমান ভোটদাতাদের প্রায় ৯৯ শতাংশই ভোট দিয়েছেন এসপি-কে। কিন্তু এখন এই প্রদেশে মুসলমানদের মোহভঙ্গ হচ্ছে। এক এক করে মুসলমান নেতারা অখিলেশের দল ছাড়ছেন।

এবার রাজ্য বিধানসভায় মোট যে ৩৩ জন মুসলমান প্রার্থী জিতে এসেছেন তাঁদের ৩২ জনই এসপি জোটের। ২০১৭ সালে জিতেছিলেন মোট ২৪ জন। যা ছিল এযাবৎকালের মধ্যে সবচাইতে কম। এবার এসপি ৬৪ জন মুসলমানকে প্রার্থী করেছিল। বিএসপি নামিয়েছিল ৮৮ জনকে। একজনও জিততে পারেননি। কংগ্রেস আরও এক কদম বাড়িয়ে মুসলমান প্রার্থী করেছিল ৭৫ জনকে। জেতার ঝুলি শূন্য। আসাদুদ্দিন ওবেইসির দল অল ইন্ডিয়া মজলিস-এ ইত্তেহাদুল-মুসলিমিন (এআইএমআইএম) প্রার্থী নামিয়েছিল ৬০ জনের বেশি। তারাও খাতা খুলতে পারেনি। তাদের ৯৮ শতাংশ প্রার্থীর জমানত বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী হিসেবে যাঁরা জিতেছেন তাঁদের মধ্যে দুজন হলেন জেলের কয়েদি আজম খান এবং তাঁর ছেলে আবদুল্লা আজম খান। এঁদের নিয়ে এসপি-র মুসলমান বিধায়ক এবার ৩০ জন। ২ জন জিতেছেন এসপি-র জোটসঙ্গী রাষ্ট্রীয় লোকদলের। আর একজন হলেন মাফিয়া ডন তথা জেলের ভাত খেতে থাকা অপরাধী মুখতার আনসারির ছেলে আব্বাস আনসারি। প্রার্থী ছিলেন এসপি জোটের আর এক সঙ্গী এসবিএসপি-র। যোগী একজন মুসলমানকে মন্ত্রী করলেও এখনো পর্যন্ত তিনি না বিধায়ক না বিধান পরিষদের সদস্য। শোনা যাচ্ছে রাজ্যপালের মনোনীত হিসেবে তাঁকে পরিষদের সদস্য করা হতে পারে।

দলিতদের ইউটার্ন : বিএসপি নেত্রী মায়াবতীর বহু কৌশলে গড়ে তোলা 'দলিত' ভোটও এবার উলটোদিকে মুখ ঘুরিয়েছে। প্রায় একচেটিয়া ভাবে চলে এসেছে বিজেপির দিকে। যোগী সরকারের উন্নয়নই যে বড়ো কারণ সন্দেহ নেই। এসপি নেতাদের মতো বিএসপি নেত্রীর কৌশল ছিল 'এম-ডি' (মুসলমান-দলিত) ভোট টেনে নেওয়া। কিন্তু ২১ শতাংশ দলিত ভোটারের সিংহভাগই এবার মায়াবতীর চালে পা দেননি। বিশেষ করে জাটবরা। দলিতদের মধ্যে জাটবদের হারই সবচাইতে বেশি, ৫৫ শতাংশ। বিএসপি-র আগে তাঁরা ছিলেন কংগ্রেসের সমর্থক। বিজেপি এবার এই সমস্ত জাতপাতের এবং বংশবাদী রাজনীতির দাবার ছক উলটে দিয়েছে।

জোটবদ্ধ মহিলা ভোট : ভারতের প্রায় সর্বত্রই এখনো মহিলা ভোটারদের 'সাইলেন্ট ভোটার' বা নীরব মতদাতা বলা হয়ে থাকে। ৫ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবারও জনসভাগুলোতে তাঁদের উদ্দেশে 'চুপচাপ কমল ছাপ'-এর আহ্বান জানান। উত্তরপ্রদেশের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে পুরুষদের চাইতে মহিলাদের ভোটদানের হার ছিল বেশি। পুরুষ ভোট পড়েছে ৫৯.৬ শতাংশ। মহিলাদের ভোট পড়েছে ৬২.২ শতাংশ। সেই সঙ্গে নতুন ভোটার বা যুব সমাজও ভালো সংখ্যায় ভোটদান করেছেন। এবারের এই বিধানসভা নির্বাচনে দেখা যাচ্ছে এসপি-র 'এম-ওয়াই' ফ্যাক্টর তেমন কার্যকরী

না হলেও বিজেপির পক্ষে ডবল এম-ওয়াই কাজে দিয়েছে। একটা এম-ওয়াই--- মোদী-যোগী। আর একটা হলো মহিলা-যুব। বিজেপি নেতাদের দাবি, এবার অনেক মুসলমান মহিলাও চুপচাপ পদ্মফুলের বোতাম টিপেছেন। যোগী ফিরে আসায় রাজ্যের অনেক জায়গায় মুসলমান মহিলারা প্রাকাশ্য রাস্তায় বেরিয়ে এসে 'নির্ভয়ে' খুশি প্রকাশ করে আগাম হোলি খেলেছেন। যোগীর দ্বিতীয় জয়ের ইতিহাসের পিছনে মুসলমান মহিলারাও যে 'নীরব ভোটার' হিসেবে কাজ করেছেন তার আরও একটা আভাষ মিলেছে গত ১০ এপ্রিল রামনবমীর দিন। অনেককে, এমনকী বোরখা-হিজাব পরিহিত হয়েও মহা উৎসাহে এবং রীতিমতো পুজোর উপকরণ হাতে নিয়ে বারাণসীর রামমন্দিরে উপস্থিত হয়ে পূজার্চনা এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে মঙ্গলারতি করতে দেখা গেছে।

বরখাস্ত বাগীরা : এবার দেশের এই বৃহত্তম রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে দলত্যাগীদের ক্ষেত্রে। কংগ্রেস, বিএসপি এবং এসপি ছেড়ে বিজেপি-তে যোগ দিয়ে যাঁরা টিকিট পেয়েছেন তাঁদের প্রায় ৬৫ শতাংশই জয়ী হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য একজন হলেন মুলায়ম সিংহের ছোটো পুত্রবধূ তথা অখিলেশের ভ্রাতৃবধু অপর্ণা যাদব। বিপরীতে বিজেপি ত্যাগ করে অন্য দলে বিশেষ করে সমাজবাদী পার্টিতে গিয়ে যাঁরা সাইকেল প্রতীকে লড়েছেন তাঁদের প্রায় ৭৫ শতাংশেরই সাইকেলের চাকা পাংচার হয়ে গেছে। অন্যতম উদাহরণ, লাগাতার ৪ বারের বিধায়ক এবং প্রাক্তন মন্ত্রী ধরম সিং সাইনি। এবার বিজেপি ছেড়ে সাইকেল চড়ে নকুব কেন্দ্রে আছাড় খেয়েছেন। দল বদলে সবাচাইতে বড়ো দুর্ঘটনা ঘটেছে ফজিলনগর কেন্দ্রে। অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং ওবিসি-দের একজন হেভিওয়েট নেতা স্বামী প্রসাদ মৌর্য গত জানুয়ারিতে যোগী মন্ত্রীসভা থেকে বেরিয়ে গিয়ে অখিলেশের হাত ধরেছিলেন। বাজারে রটেছিল এসপি সরকার গড়লে তাঁকে উপমুখ্যমন্ত্রী করার টোপ দিয়েছিলেন সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো। স্বামী প্রসাদ যে দলেই যান এবং যেখান থেকেই দাঁড়ান তাঁকে কেউ হারাতে পারবে না এরকম একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। সেই মৌর্য 'সম্রাট'-এর পতন ঘটেছে। বিজেপি-র সুরেন্দ্র কুশওয়াহার কাছে বিপুল ভোটের ব্যবধানে ধরাশায়ী হয়েছেন।

কিছু বিশেষ ক্ষেত্র : কেন্দ্র সরকারের কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে তথাকথিত ধনী কৃষকদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে অনেকের ধারণা হয়েছিল উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি বড়ো ধাক্কা খেয়ে যেতে পারে। বিশেষত পশ্চিম ইউপি-তে। কার্যত দেখা গেছে এই ধারণা অমূলক ছিল। রাজ্যের পশ্চিম ক্ষেত্রে বিধানসভার মোট আসন রয়েছে ৯৭টি। তার মধ্যে ৬৯ আসনই বিজেপির দখলে এসেছে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে ওই কৃষক আন্দোলন বিজেপির বিরুদ্ধে তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। রাজ্যের বিশেষ কয়েকটা ক্ষেত্র যেমন উন্নাও, লখিমপুর খেরি, হাথরসের মতো উত্তেজনাপ্রবণ কেন্দ্রও বিজেপি দখল করে নিয়েছে। অবধ ক্ষেত্রে মোট আসন সংখ্যা ১১১টি। অযোধ্যার ৮টি আসনের সবগুলো-সহ অবধ ক্ষেত্রে বিজেপি জিতেছে ৭৮ আসনে। এসপি ৩৩টা। বুন্দেলখণ্ডে মোট ১৯টা আসনের সবগুলোই চলে এসেছে বিজেপির ঝুলিতে। রোহিলাখণ্ডে মোট ৫২ আসনের মধ্যে ২৮টিতে জিতেছে বিজেপি। এসপি পেয়েছে ২৩টি। আর পূর্বাঞ্চলে মোট ১২৪ আসনের মধ্যে পদ্ম ফুটেছে ৭৯টিতে। সাইকেল চলেছে ৪০ আসনে।

একচেটিয়া জয়-পরাজয় : বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে ছিল পঞ্চায়েত নির্বাচন। তাতে অনেক জায়গায় সমাজবাদী পার্টি ভালো ফল করেছিল। বিজেপি অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছিল এমনকী অযোধ্যা, মথুরা গোরক্ষপুর ও বারাণসীর মতো হিন্দুদের ধর্মীয় ক্ষেত্রের জেলাগুলোতেও। তখন থেকে প্রচার তুঙ্গে তোলার চেষ্টা চলছিল বিজেপির বিরুদ্ধে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের 'সেমিফাইনাল', বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদীর 'অ্যাসিড টেস্ট' ইত্যাদি আওয়াজ তুলে প্রচারের ঢাক পেটানো শুরু হয়েছিল। অনেক সংবাদমাধ্যম এই সুরে পোঁ ধরে মতামত সম্প্রচার করে যাচ্ছিল। বার বার এই সমস্ত ধর্মস্থান-কেন্দ্রিক জেলাগুলোর উল্লেখ করা হচ্ছিল। ২০২২-এর নির্বাচনকে ২০২৪-এর 'ট্রায়াল রান' বলে মনে করছিলেন অনেক পর্যালোচক। ফলাফলে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে কিষাণ আন্দোলনের মতো বিশেষ পরিস্থিতিতে কোথাও পঞ্চায়েত নির্বাচন আর রাজ্যে সরকার গঠনের জন্য বিধানসভা নির্বাচন এক নয়। ৪০৩ আসনের মধ্যে বিজেপি-জোট ৩৭৩ আসন দখল করে নিয়েছে তাই নয়, বিশেষে ৪টে ধর্মীয় জেলার ফলাফল একেবারে তাক লাগাবার মতো। গোরক্ষপুরের ৯টার মধ্যে ৯টা, অযোধ্যায় মোট ৮টার মধ্যে ৮টা। ভোটের আগে অযোধ্যা জেলায় বিজেপির একটা স্লোগান ছিল 'একই হ্যায় নারা, একই হ্যায় নাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম'। মথুরা জেলায় ৭টার ৭টাই এবং বারাণসী জেলায় মোট ৮টার ৮টা আসনেই বিজেপির একচেটিয়া জয়জয়কার হয়েছে। একচেটিয়া পরাজয় ঘটেছে এসপি-র। তারপর থেকে ২০২৪-এর 'সেমিফাইনাল', 'অ্যাসিড টেস্ট' কিংবা 'ট্রায়াল রান'-এর প্রচারওয়ালাদের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। উল্লেখিত একাংশ সংবাদমাধ্যমও মুখে কুলুপ এঁটেছে।

কংগ্রেসকে ভিআইপি-র টেক্কা : এবারের নির্বাচনে অন্তত ১৫টি আসনে ভিআইপি-র প্রার্থীরা কংগ্রেসকে টেক্কা দিয়েছেন। 'বিকাশশীল ইনসাফ পার্টি' নামের এই নতুন দল এবারই প্রথম নির্বাচনে নেমে ১০৫ আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। অধিকাংশেরই জমানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। কিন্তু অন্তত ১৫ আসনে তারা কংগ্রেসের চাইতে বেশি ভোট দখল করেছে।

যোগীর রেকর্ড জয় : এই প্রতিবেদনে ইতিটানার আগে খুব ছোট্ট করে যে কথাটা না জানালে নয় তাহলো, উত্তরপ্রদেশ মন্ত্রীসভার যতজন সদস্য এবার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচাইতে বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। প্রায় ১ লক্ষ ২২ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন তিনি। হারিয়েছেন সমাজবাদী পার্টির প্রার্থীকে।

গীতা ও রামায়ণ-মহাভারতে রয়েছে মূল্যবোধের শিক্ষা

তরুণ কুমার পণ্ডিত

সম্প্রতি কর্ণাটক ও গুজরাট-সহ বেশকিছু বিজেপি শাসিত রাজ্যের পাঠ্যক্রমে গীতা ও রামায়ণ অন্তর্ভুক্ত করায় বিরোধীদলগুলো শিক্ষায় গৈরিকীকরণের অভিযোগ তুলেছে। সত্যিই কি সেই রাজ্যগুলোতে গীতা, রামায়ণ-মহাভারত পাঠ্যক্রমে আসায় শিক্ষা ব্যবস্থা গৈরিকীকরণের দিকে যাচ্ছে?

প্রসঙ্গত, দেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭৯ সালে এনসিইআরটি 'Documents in Social, Moral and Spritual valus in Education' নামে একটি সুচি প্রকাশ করে। তাতে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত সামাজিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষার বিভিন্ন কমিশনের কথা উল্লেখ করেছে। সেখানে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত গঠিত বিভিন্ন কমিটি নীতি ও ধর্মভিত্তিক শিক্ষানীতির কথা বলেছে। কিন্তু কোনো সরকার দৃঢ়তার সঙ্গে তার প্রয়োগ করতে পারেনি। ২০০০ সালে সংসদের একটি স্থায়ী সমিতি গঠিত হয় যেখানে ৪৪ জন সদস্যের এই সমিতিতে চেয়ারম্যান ছিলেন কংগ্রেসের শঙ্কর রাও চৌহান। তিনি একসময়ে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও ছিলেন।

স্থায়ী সমিতির মতামতকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে গঠিত সংসদের মতামত বলা যেতে পারে। সংসদের ওই স্থায়ী সমিতির মূল্যবোধের শিক্ষা বিষয়ক একটি উপসমিতি গঠন করে এবং একটি রিপোর্ট তৈরি করে। ২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে ওই রিপোর্ট সংসদে পেশ করা হয়। এই রিপোর্টের যে সুপারিশ তা পড়লে মনে হয় এর থেকে বেশি গৈরিকীকরণ তো করা সম্ভব নয়। ওই রিপোর্টে স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলা হয়েছে।

শিক্ষা কেবলমাত্র তথ্য সংগ্রহের ব্যাপার নয়, এর সঙ্গে চরিত্র নির্মাণও প্রয়োজন। আমাদের দেশের বর্তমান প্রজন্ম দেশের অতীত সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে অজ্ঞ। আজ স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও তারা এ থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। বর্তমান প্রজন্মকে নীতি শিক্ষা ও ধর্মীয় মূল্যবেধের শিক্ষা দিতে হবে বলে সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে। গতবছর বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছে যেখানে প্রাচীন মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা এবং সংস্কৃত ভাষার উন্নতির কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও এই শিক্ষা নীতিতে মাতৃভাষা এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতি বাতিল করে নিজস্ব শিক্ষানীতি চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। তারা কেন্দ্রের ধর্মীয় ও সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধিতা করবে কিন্তু এ রাজ্যের পাঠ্যপুস্তকের বিকৃতি চালিয়ে যাবে। এ বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে বলা হয়েছে সংস্কৃত পড়ানো সেকুলারিজমের বিরুদ্ধাচরণ নয়। ভারতের সংবিধান লেখার সময় ড. আম্বেদকর সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। জার্মানি ও আয়ারল্যান্ড-সহ বিশ্বের বহু দেশ আজ তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ানোর ব্যবস্থা করেছে। যদিও দেশের শিক্ষবিদ ও বিদগ্ধ ব্যক্তি বা ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক মূল্যবোধ বাড়াতে গীতা, রামায়ণ, মহাভারতের শিক্ষা সাহায্য করবে বলে মনে করছেন।

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মহম্মদ আবু রাইহানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মুসলমান হিসেবে হিন্দুদের রামায়ণ, মহভারত ও গীতা নিয়ে আপনার মতামত কী? উত্তরে তিনি বলেন,

> গীতা হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, গীতা মানব জাতির সম্পদ।'

'হিন্দুদের রামায়ণ ও মহাভারত'— এই কথাতেই আমার আপত্তি। রামায়ণ, মহাভারত ও গীতাকে হিন্দুরা আপন করেছে বলে তা কি মুসলমান বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে পর হয়ে যাবে? খুব বাজে ধারণা। সূর্যও তো হিন্দুদের দেবতা, তাহলে সূর্যের কিরণ কি আমি নেবো না? চন্দ্রও তো হিন্দুদের দেবতা, আমি কি জ্যোৎস্নায় কবিতা লিখবো না? সনাতন ধর্মের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আত্তীকরণ। উপমহাদেশ বা মহাকাশের য কিছুকেই ধর্মের মধ্যে 'আত্তীকরণ' বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যকে তারা ধর্মের মহাকাব্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। তো আমার সমস্যা কী? আমি বঞ্চিত হতে চাই না। এই অমৃত সুধা আমি বার বার পান করে সুখী হতে চাই।'

একই ভাবে বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত মাসরুফ হোসেন 'গীতা' সম্পর্কে বলেন, গীতা প্রতিটি মানুষের জন্য অত্যন্ত জরুরি। একটি সুন্দর, তেজোদীপ্ত, কর্মময় জীবনের জন্য এই গ্রন্থ খুব প্রয়োজন। গীতার অমর বাণী শুধু হিন্দুদের একার নয়, যে মানুষটি শিখতে চায়, সে ধার্মিক বা নাস্তিক যাই হোক না কেন গীতায় তার জন্মগত অধিকার। আমি হিন্দু নই, জন্ম মুসলমান পরিবারে, কিন্তু আমার কাছে গীতা সংক্রান্ত ১৩টি বই রয়েছে। গীতা হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, গীতা মানব জাতির সম্পদ।'

তাই শিক্ষা ব্যবস্থায় রামায়ণ, মহাভারত ও গীতাকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার মধ্যে দিয়ে যারা গৈরিকীকরণের গন্ধ পাচ্ছেন, এই কথাগুলো নিশ্চয় তাদের বোধোদয় ঘটাতে সহায়ক হবে। □

ভেজাল ঠেকাতে রাস্তায় নামলেন

ডক্টর সুনীতা দেবী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। তিনি একজন পুষ্টিবিদ। নামের আগে জ্বলজ্বল করে ডক্টরেট স্বীকৃতি। রয়েছে প্রথাগত ডিগ্রিও। তবু নিজের বাঁধা পেশার বাইরে গিয়ে দীর্ঘ ৩০ বছর বাড়িতে রান্না করা খাবার তিনি বিক্রি করছেন রাস্তার ধারের একটি স্টলে। সম্প্রতি মুম্বইয়ের রাজপথে খোঁজ পাওয়া গেছে ড. সুনীতা দেবীর। যিনি নিজের পেশার বাইরে রাস্তার ধারের দোকানে সুলভে স্বাস্থ্যকর খাবার তুলে দিচ্ছেন মানুষজনের হাতে।

সর্বপ্রথম এক ফুড ব্লগার এই ঘটনাটিকে সামনে আনেন তাঁর ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে। সেখানেই দেখা যায়, সুনীতা দেবী তাঁর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে খাবার বিক্রি করছেন। ভিডিয়োটিতে তিনি জানান সমস্ত খাবারই স্বাস্থ্যসম্মত। কোনো ধরনের প্রিজারভেটিভ বা ভেজাল নেই খাবারে। খাবারগুলো নিয়মিত বাড়িতে নিজের হাতেই রান্না করেন সুনীতা।

৫৫ বছর বয়সি ডক্টর সুনীতা পেশায় একজন নিউট্রিশনিস্ট ও ডায়েটেশিয়ান। রোগী কী খাবেন, কী খাবেন না। কী কী খেলে হতে পারে স্বাস্থ্যোদ্ধার তা নির্ধারণ করে দেন তিনি। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে। এহেন পুষ্টিবিদ যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে খাবার বিক্রি করেন, তা দেখে চমক লাগারই কথা। আসলে সুনীতাদেবীর এই কাজের পিছনে রয়েছে মহৎ উদ্দেশ্য। তাঁর কথায়, 'একজন পুষ্টিবিদ হিসেবে আমি জানি, আজকালকার দিনে বাড়ির বাইরে স্বাস্থ্যসম্মত নির্ভেজাল খাবার পাওয়া খুবই দুষ্কর। তাই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়, স্বল্প সামর্থ্যে অন্তত কিছু মানুষকে ভালো বিশুদ্ধ খাবার খাওয়ানোর প্রয়াস করছি।'

সুনীতা দেবীর এই মহৎ কর্মযজ্ঞে শামিল হয়েছেন তাঁর স্বামীও। দুজনে মিলে এই উদ্যোগকে আরও ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। ইচ্ছা করলেই অনায়াসে একটা রেস্তোরাঁ খুলতে পারেন সুনীতা। তা না করে রাস্তার ধারের দোকান কেন? সুনীতাদেবী কারণ হিসেবে বলেছেন, 'স্ট্রিটফুড খেতে আমরা কম-বেশি সকলেই ভালোবাসি।

খাবারের স্বাদের পাশাপাশি এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে জীবনের গল্পও। অনেক সময় সেই গল্প খাবারের স্বাদের থেকেও বেশি মুখরোচক হয়ে ওঠে। একটা নস্টালজিয়ার মতো।' শিক্ষাজীবনে ধারাবির রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় এভাবেই বহুদিন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে খেতেন সুনীতাদেবী।

তবে খাবারের গুণমান তাঁর রসনাকে তেমন তৃপ্তি দেয়নি। সেই টানেই পেশাজীবনের সমস্ত ব্যস্ততা সামলেও নিয়মিত বাড়িতে তৈরি খাবার নিয়ে এসে বিক্রি করেন সুনীতা। তাও আবার স্বল্পমূল্যে। মাত্র ৪০ টাকার বিনিময়ে ভাত, ডাল, দুটো তরকারি, রুটি, পুড়ি, আচার ও পাঁপড়। মুম্বইয়ের মতো বাণিজ্যিক শহরে এই বিনিময়মূল্য নগণ্য। হয়তো তেমন আর্থিক সাশ্রয় হয় না। কিন্তু ভোজনরসিকরা যখন সেই খাবারের গুণমানের প্রশংসা করেন। উপচে পড়ে ভিড়। পরিতৃপ্ত হন সুনীতা দেবী। দোকানে পুরোটাই একা হাতে সামলান তিনি।

এক ইনস্টাগ্রাম ফুড ব্লগার সম্প্রতি তাঁর পোস্টে সুনীতাদেবীর স্টল এবং স্টলে তাঁর কাজ নিয়ে লিখেছেন। সুনীতার মতে, ইচ্ছে থাকলে একজন মানুষ একই সময়ে চারটে কাজও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন। তাই নিজেই সেই আপ্তবাক্য মেনে নিয়ে পেশায় বাইরে গিয়ে খাবারের দোকান চালাচ্ছেন তিনি।

সুনীতাদেবীকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড হওয়া ভিডিয়োটিতে ৩০ হাজারেরও বেশি ভিউজ এসেছে। ভিডিয়োটি এখন পর্যন্ত লাইক করেছেন ১৮ হাজার মানুষ। নিউট্রিসনিস্ট ও ডায়েটেশিয়ান পরিচয়ের বাইরে তাঁর এই ভূমিকায় মুগ্ধ নেটদুনিয়া। খাবারের স্বাদও ভালো বলে জানিয়েছেন বহু ভোজনরসিক। সুনীতাকে বাহবা ও কুর্নিশ জানিয়েছেন নেট নাগরিকরা। এই প্রশংসা তাঁর কাজকে আরও বড়ো করার প্রেরণা জোগাবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য নগরীর এই কন্যা। তিনি বলেন, 'বর্তমান সময়ে সর্বত্রই ভেজালের রমরমা। খাঁটি জিনিসটাই উধাও হয়ে গেছে। অসাধু ব্যবসায়ীরা কম লগ্নি করে বেশি মুনাফা লাভের চেষ্টায় মানুষকে ভেজাল খাওয়াচ্ছে। আমার প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটা সচেতনতা গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার এই উদ্যোগ দেখে আগামীদিনে বহু মানুষ বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়ে ভেজাল দূরীকরণে এভাবেই পথে নামবেন। ☐

কেউ অমর নয়

বহু বছর আগে বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একদিন তিনি একটি অশ্বত্থগাছের নীচে তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। সেসময় তিনি ধ্যানবলে দেখলেন— জম্বুদ্বীপের বাসিন্দাদের অবস্থা, তারা কে কেমনভাবে দিন কাটায়।

তখন পোতালি নগরের রাজা ছিলেন অশ্বক। তিনি খুব সাহসী ছিলেন। তাঁর পত্নীর নাম ছিল উর্বরী। উর্বরী ছিলেন খুব সুন্দরী। রাজা অশ্বক তাঁকে প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসতেন। তাঁকে এক মুহূর্ত না দেখে তিনি থাকতে পারতেন না।

একদিন সকালে রাজা ঘুম থেকে উঠে দেখলেন উর্বরী ঘুমের মধ্যেই মারা গেছেন। রাজার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। গভীর শোকে তিনি খাওয়াদাওয়া, কাজকর্ম সব ছেড়ে দিলেন। দিনরাত শুধু চোখের জল ফেলেন। রাজা অশ্বক পত্নীর মৃতদেহটিতে আরক মেখে একটি ডোঙ্গার ভিতরে রেখে সেটি নিজের পালঙ্কের নীচে রেখে দিলেন।

বোধিসত্ত্ব ধ্যানদৃষ্টিতে সবকিছু দেখতে দেখতে চমকে উঠলেন। দেখলেন রাজা অশ্বক পত্নীশোকে মৃতপ্রায়। এসব দেখে বোধিসত্ত্বের প্রাণ কেঁদে উঠল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, রাজা অশ্বকের কষ্ট যে করেই হোক দূর করতে হবে। এই ভেবে তিনি যোগবলে বারাণসীতে এসে রাজার সুন্দর উদ্যানে একটি গাছের নীচে ধ্যানমগ্ন হলেন।

রাজার বাগানে তখন এক ব্রাহ্মণ পূজারি ফুল তুলছিলেন। ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বকে দেখতে পেয়ে দুহাত জোড় করে বললেন, প্রভু,আপনি এখানে?

বোধিসত্ত্ব তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, ‘আপনি আমায় একটি প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন?

ব্রাহ্মণ বললেন, আজ্ঞে, বলুন প্রভু।’

আচ্ছা, তোমাদের রাজা খুব ধার্মিক?’

ব্রাহ্মণ তখন রাজার উদ্দেশে দুহাত কপালে তুলে বললেন, ‘ধার্মিক তো বটেই, তিনি বিনয়ী ও ভদ্রও বটে। তবে অকালে পত্নীবিয়োগ হওয়ায় তিনি শোকে আহার, নিদ্রা, সব কাজকর্ম ত্যাগ করেছেন।’

ব্রাহ্মণ হাঁটু মুড়ে বসে বোধিসত্ত্বকে বললেন, প্রভু আপনিই রাজাকে রক্ষা করতে পারেন।’

বোধিসত্ত্ব স্বর্গীয় হাসি হেসে বললেন, ‘দেখো ব্রাহ্মণ, তোমাদের রাজার সঙ্গে তো আমার পরিচয় নেই, রাজা যদি একবার আমার কাছে আসেন, তবে আমি বলে দিতাম তাঁর পত্নী এখন কোথায় আছেন, এমনকী তাঁর সঙ্গে রাজার কথাও বলিয়ে দিতে পারতাম।’

খুশিতে ব্রাহ্মণের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বিনয়ী স্বরে বললেন, ‘প্রভু, তাহলে আমি রাজাকে নিয়ে এসে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই?’

বোধিসত্ত্ব ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে ব্রাহ্মণ রাজার কাছে এসে সব কথা বললেন। রাজা আর একমুহূর্ত দেরি না করে বোধিসত্ত্বের কাছে চলে এলেন। বোধিসত্ত্বের সামনে হাত জোড় করে রাজা বললেন, ‘ব্রাহ্মণ আমাকে যা কিছু বলেছেন, সব কি সত্যি?’ বোধিসত্ত্ব হেসে বললেন, ‘ব্রাহ্মণ আপনাকে ঠিকই বলেছেন মহারাজ, আপনার পত্নীর পুনর্জন্ম হয়েছে। এই উদ্যানেই আপনার পত্নী গুবরেপোকা হয়ে জন্মেছেন।’

এই কথা শুনে রাজা চিৎকার করে উঠলেন, ‘না না , এ কখনোই হতে পারে না, আমি বিশ্বাস করি না।’

বোধিসত্ত্ব স্মিত হেসে বললেন, ‘ মহারাজ, আপনার পত্নী একসময় অসৎ কাজ করেছিলেন, তাই এই জন্মে পোকা হয়ে জন্মেছেন।’

মহারাজ আবার চিৎকার গুবরেপোকাগুলোকে ডাকলেন। বোধিসত্ত্বের তপস্যার শক্তিতে পোকাগুলো ধীরে ধীরে মহারাজের সামনে এসে গেল। তার মধ্যে প্রথম দুটোকে দেখিয়ে বোধিসত্ত্ব রাজাকে বললেন, ‘মহারাজ, এই পেছনেরটা আপনার পত্নী।’ তবু রাজার বিশ্বাস হলো না। তখন বোধিসত্ত্ব যোগবলে পোকাটির মধ্যে কথা বলার শক্তি সঞ্চার করে ডাকলেন, ‘উর্বরী!’

গুবরেপোকা বোধিসত্ত্বের দুহাত দূরে থেমে বলল, ‘ আদেশ করুন প্রভু।’

‘আগের জন্মে তোমার নাম কী ছিল?’

‘উর্বরী প্রভু।’

‘অশ্বকরাজ তোমার কে ছিলেন?’

‘স্বামী প্রভু।’

বোধিসত্ত্ব আবার প্রশ্ন করলেন, ‘ আচ্ছা, এবার বলো তো, তুমি এখন কাকে বেশি ভালোবাসো? অশ্বকরাজাকে না তোমার সঙ্গের গুবরেপোকাটিকে?’

গুবরেপোকা বলল,‘প্রভু, অশ্বকরাজ পূর্বজন্মে আমার স্বামী ছিলেন। এখন কেউ নন। প্রয়োজনে আমার এই জন্মের স্বামীর জন্য অশ্বকরাজাকে দংশন করতেও পিছপা হবো না।’

সবকিছু দেখে শুনে রাজার ভুল ভেঙে গেল। বোধিসত্ত্বের কথায় এবার তার বিশ্বাস হলো। অনুচরদের আদেশ দিলেন পালঙ্কের নীচে রাখা রানির মৃতদেহটিকে পুড়িয়ে ফেলতে। তারপর গঙ্গায় স্নান করে বোধিসত্ত্বের আশীর্বাদ নিয়ে রাজ্যশাসনে মন দিলেন।

(সংগৃহীত)

ভারতের বিপ্লবী

ভূদেবপ্রসাদ সেন

বিপ্লবী ভূদেবপ্রসাদ সেনের জন্ম ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর ডাকনাম ছিল ননী। ছাত্রাবস্থায় ময়মনসিংহে যুগান্তর দলে যোগ দেন। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বিনা বিচারে দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ ছিলেন। মুক্তি পাবার পর ভারত-ছাড় আন্দোলনের সময় আত্মগোপন করে রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যেতেন। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় সম্প্রীতির প্রচেষ্টাকালে আততায়ীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারান।

জানো কি?

- হুগলী জেলার পূর্বদিকে রয়েছে গঙ্গানদী।
- জেলার অন্য নদীগুলি হলো দ্বারকেশ্বর, দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী, বেহুলা।
- সপ্তগ্রাম হলো রাঢ়বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী, বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র।
- তারকেশ্বরে রয়েছে বাবা তারকনাথের মন্দির।
- কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মস্থান।
- প্রথম বাংলা সংবাদপত্র শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়।
- দেবানন্দপুরে কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান।

ভালো কথা

এক টাকার ওষুধ

যখন প্রথম করোনা মহামারীর কথা শোনা গেল, তখন আমাদের পাড়ার শ্যামা জেঠু সবাইকে ডেকে ডেকে এক পুরিয়া হোমিয়োপ্যাথি ওষুধ দিতেন।দাম একটাকা নিতেন। বলতেন সকালে খালিপেটে খেতে হবে আর ভিড়ের মধ্যে যাওয়া চলবে না। শুধু আমাদের পাড়া নয়, আশেপাশে চার-পাঁচটি গ্রামের লোকেরা এসে ওষুধ নিয়ে যেত। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আমাদের গ্রাম-সহ ওই চার-পাঁচটি গ্রামের কেউ কারোনায় আক্রান্ত হয়নি। এবছর রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিন শ্যামাজেঠুকে তাঁর মানবসেবার জন্য আমাদের গ্রামের ক্লাবে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে।

কুণাল ঘোষ, দশম শ্রেণী, পাকুড়, ঝাড়খণ্ড।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) খ খা ব র

(২) গা গা লি লা

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) চি চা খা খা ম ম

(২) খি খি চি চি র র

২ মে সংখ্যার উত্তর

(১) নিরাপত্তা (২) জরিমানা

২ মে সংখ্যার উত্তর

(১) তারকাশোভিত (২) তুষারধবল

উত্তরদাতার নাম

(১) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কল-৪৯।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

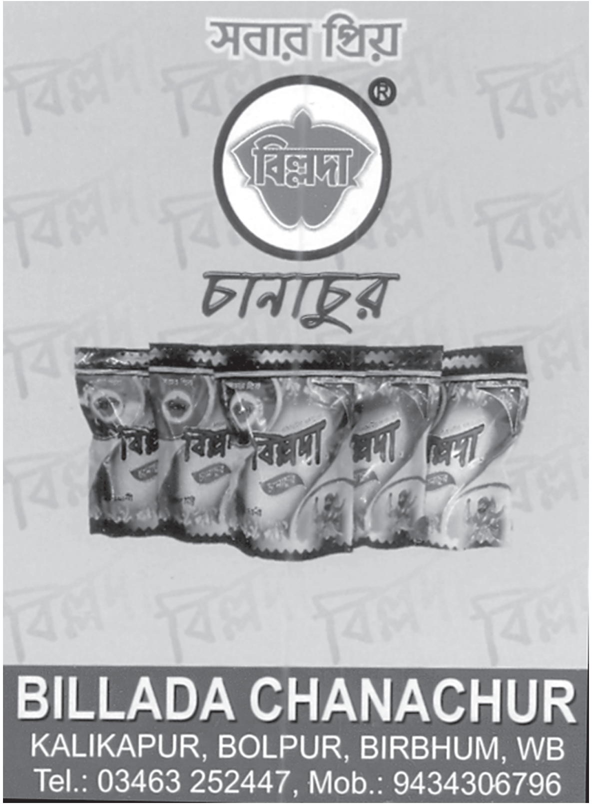

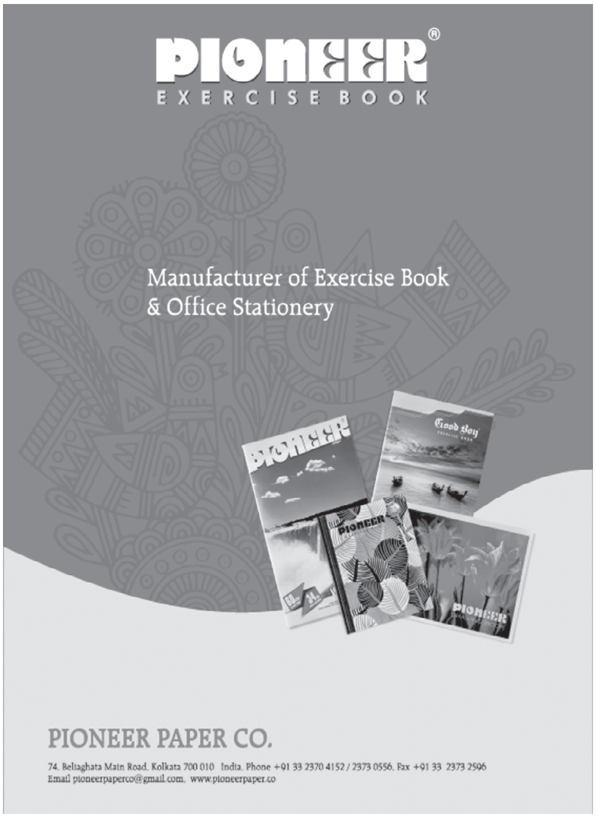

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

ভারতীয় ইতিহাসে নোবেল চুরি 'ন্যাশনাল মিস্ট্রি'

হীরক কর

২৫ মার্চ, ২০০৪, বৃহস্পতিবার। সকাল ১০টা ১৫ মিনিট। শান্তিনিকেতন। রোজকার মতো ডিউটিতে এসেছে কাটকি। উত্তরায়ণের মালি। মূলত উদয়ন বাড়ি দেখভাল করে। কিন্তু এদিন রবীন্দ্রভবনের বিচিত্রা বাড়ির আশপাশে ফুলগাছ পরিচর্যা করতে এসেছিল কাটকি। কিন্তু ঢুকতে গিয়ে চমকে উঠলো, বিচিত্রা বাড়ির দরজা হাট করে খোলা। আঁতকে উঠল। ভিতরে ঢুকে বাঁ দিকে গেলে রবীন্দ্রনাথের মিউজিয়াম। সেই মিউজিয়ামের দরজা খোলা। চারিদিকে কেমন যেন সব লণ্ডভণ্ড। কাটকি কালবিলম্ব না করে খবর দিল বিশ্বভারতীর সেন্ট্রাল অফিসে। ছুটে এলেন কর্তারা। দেখা গেল, মিউজিয়ামের গ্যালারি থেকে চুরি গেছে রবীন্দ্রনাথের নোবেল।

ফ্লাশব্যাক-১৯১৩। গুরুদেবের মাথায় তখন একটাই চিন্তা শান্তিনিকেতনের নিকাশি ব্যবস্থা কীভাবে হবে। টাকা কোথায়। কবি তখন প্রায় নিঃস্ব। ভাইপো দিনেন্দ্রনাথ ও পুত্র রথীন্দ্রনাথকে নিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চৌপাহাড়ির শালবনে ঘুরতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সঙ্গে আছেন ক্ষিতিমোহন সেনও। শালবীথি ধরে এগোচ্ছেন। এমন সময় ছুটতে ছুটতে এলেন তেজেশ চন্দ্র সোম,— গুরুদেব একখানা টেলিগ্রাম এসেছে। কলকাতা থেকে তারবার্তা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ 'Song Offerings'-এর জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন! সবটা শুনে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, কত টাকা পাওয়া যাবে? তেজেশ সোমের উত্তর, প্রায় এক লাখ। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কবি। যাক; তাহলে তোমাদের নিকাশি ব্যবস্থাটা হয়ে গেল।

এই নোবেল পুরস্কার শুধু সাহিত্যেই নয়, পুরো উপমহাদেশের জন্যই ছিল প্রথম নোবেল। গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯১৩ সালে বাঙ্গালির প্রথম নোবেল জয় এসেছিল বিশ্বকবির হাত ধরে। পদকটি রাখা হয়েছিল কবির নিজের হাতে গড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর মিউজিয়ামে।

উত্তরায়ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঁচটি বাড়ির সংকলন। শান্তিনিকেতন। এখানেই

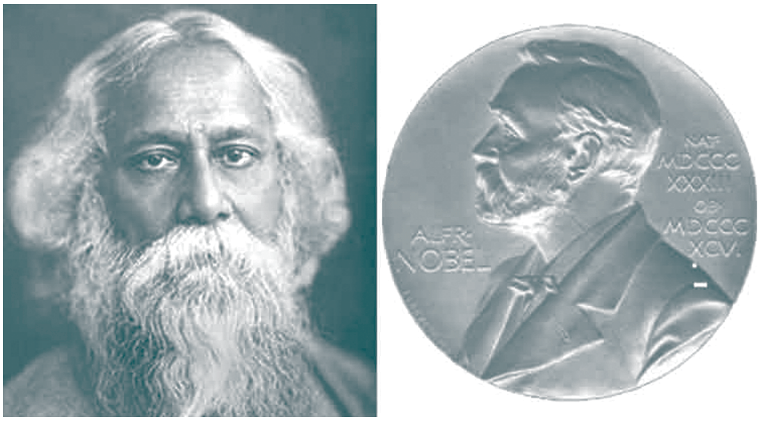

বিশ্বকবি নির্মিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। সেই ১৯২১ সাল থেকে স্বমহিমায় উজ্জ্বল। উত্তরায়ণ চত্বরেই ১৯৬১ সালে বিশ্বভারতীর ৫০ বছর বয়স উপলক্ষ্যে নির্মিত হয় 'বিচিত্রা' বাড়ি বা রবীন্দ্রভবন। যেখানে বিশ্বভারতীর মিউজিয়াম ও আর্কাইভ।

বুধবার ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীদের উপাসনার দিন। তাই বুধবার বিশ্বভারতীর ক্লাস হয় না। সেই কারণেই পরদিন বৃহস্পতিবার স্বভাবতই একটু বেশি ব্যস্ততা থাকে শান্তিনিকেতনে। শুধু ব্যস্ততা নয়, তার সঙ্গে সময়ের সবচেয়ে দুঃখজনক খবরটাই তিরের বেগে ছড়িয়ে পড়ে। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন তথা রবীন্দ্র সংগ্রহশালার জানালার গ্রিল ভেঙে চোর ঢুকেছিল। শান্তিনিকেতন তদন্ত কেন্দ্রে খবর দেওয়া হলো। তড়িঘড়ি হাজির হন তৎকালীন বোলপুরের ওসি মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার দুপুর ১টায় বন্ধ হয়ে যায় শান্তিনিকেতন। বৃহস্পতিবার রবীন্দ্র ভবন খুলতেই ধরা পড়ে চুরির ঘটনা। কিন্তু কীভাবে চুরি হয় তা নিশ্চিত নয় পুলিশ। মঙ্গলবার বিশ্বভারতী বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই চোরেরা ভেতরে ঢুকে অবস্থান নেয়। সারারাত ধরে মালপত্র সরাতে থাকে। রবীন্দ্রভবনের পেছনের জানালা ভেঙে ফেলে চোর, দেওয়ালের নীচে পাওয়া যায় ভাঙা গ্রিল। সেই জানালা দিয়ে মালপত্র সরিয়ে নেয়। পুলিশ বলে, চোর জানালা দিয়ে ঢোকেনি। কারণ, সেক্ষেত্রে জানালার পাল্লা ভেঙে ফেলতে হতো। উত্তরায়ণের এই বিশাল এলাকা নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল মাত্র দুজন এনডিএফ কর্মী।

এরপরেই সাঁই সাঁই করে ভ্যান ছুটিয়ে পুলিশ এসে ঘিরে ফেলল গোটা রবীন্দ্রভবন। চলে এলেন এসপি বীরভূম অখিল রায়। ভবনের পেছনে ভাঙা জানালায় পাওয়া গেল ২৮ জোড়া পায়ের ছাপ। তার মধ্যে আবার দুজনের পায়ের হাওয়াই চটির ছাপ। কিন্তু তাতে কী আর লাভ? যা চুরি যাওয়ার তা তো ততক্ষণে চুরি হয়েই গেছে! কিন্তু কী এমন চুরি গেল যে তা নিয়ে এতো তোলপাড়? নোবেলের মতো মহার্ঘ্য চুরির পেছনে দুটো কারণ থাকতে পারে। এক, যদি এটা ছোটোখাটো চোরদের কাজ হয় তাহলে তাদের উদ্দেশ্য থাকবে মেডেল গলিয়ে সোনা বের করা। দুই, (যেটার সম্ভাবনা বেশি) কোনো বড়ো কালেক্টরের এটার প্রতি নজর। বিদেশের বাজারে নোবেল পুরস্কারের মতো জিনিস (চুরি

ফঃ ৬

হোক বা অরিজিনাল) প্রচুর দাম তুলতে সক্ষম। ফলে মেডেল চুরির পর সেটা খুব দ্রুতই দূরে কোথাও পাচার করে দেওয়া হয়, যেটা এই ক্ষেত্রে হয়েছিল। যদিও অনেকেরই ধারণা নোবেল শান্তিনিকেতনেই আছে।

চুরি যাওয়া জিনিসগুলোর দিকে একটু চোখ বোলালেই বোঝা যাবে এই হইচইয়ের মর্মার্থ। চুরি যায় মোট ৩৭টা জিনিস। মৃণালিনী দেবীর বালুচরি শাড়ি, রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনার আংটি, সোনা-রুপোর কিছু জিনিসপত্র, রবীন্দ্রনাথের প্রিয় সোনার পকেট ঘড়ি-সহ আরও কিছু জিনিস। আর তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কারের মানপত্র এবং খোদ নোবেল পদকটাই। যে পদকটা এখন পর্যন্ত বাঙ্গালিদের পাওয়া শ্রেষ্ঠ অর্জনের ভেতর অন্যতম।

নোবেল পদকের সঙ্গে আরও যেসব পণ্য চুরি হয় সেগুলি হচ্ছে— (১) রৌপ্য পদক, (২) 'ওঁ' লেখা সোনার আংটি, (৩) জামার সোনার বোতাম, (৪) কাফ লিঙ্ক, (৫) মৃণালিনীদেবীর শাড়ি, (৬) সোনা-বাঁধানো নোয়া, (৭) রুপোর রেকাবি, (৮) রুপোর কফি কাপ, (৯) সামুরাই তরবারি, (১০) কফি কাপ রাখার তেপায়া, (১১) চৈনিক চামচ (১২) কোবে শহর থেকে পাওয়া হাতির দাঁতের ঝাপি-সহ আরও ৪৭টি জিনিস। অপহৃত সম্পদের মধ্যে সোনার পরিমাণ : (১) নোবেল পদক ২০৬ গ্রাম, (২) সোনা বাঁধানো নোয়া ৮ গ্রাম, (৩) 'ওঁ' লেখা সোনার আংটি ৩ গ্রাম, (৪) 'আর, টি' লেখা সোনার পকেট ঘড়ি ১২৫ গ্রাম, (৫) সোনা বাঁধানো হাঁটতে বেরোবার লাঠি, ৩৪৭ গ্রাম, (৬) সোনার জামার বোতাম, (৭) সোনার মেডেল ৮ গ্রাম, (৮) কমলা সোনার মেডেল ১০৩.৫ গ্রাম, (৯) স্টার সোনার মেডেল ৮ গ্রাম, (১০) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত দশ পাপড়ির সোনার পদ্ম ৪৯৩ গ্রাম, (১১) সোনার কানের টপ এক জোড়া, (১২) ঠিকানা লেখা তিনটি সোনার প্লেট ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের সোনার পকেটঘড়ির মূল্য ঐতিহাসিক। ওই ঘড়িটি বিশ্বভারতীর স্থাপনের পরে আর্থিক অনটনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর লাহোর নিবাসী বন্ধু অক্ষয় চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী শরৎকুমারী দেবীর কাছে বিক্রি করেন। পরে ১৯৬০ সালে রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিয়ের সময় ওই ঘড়িটি উপহার দেন ওই দম্পতি। প্রশান্ত পালের রবিজীবনী'র পঞ্চম খণ্ডে এর উল্লেখ আছে। ওই ঘড়িটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করতেন বলে রথীন্দ্রনাথ ১৯৪২ সালে তাঁর শান্তিনিকেতনের শেষ ঠিকানা 'উদয়ন' বাড়ির সংগ্রহশালায় রেখে দিয়েছিলেন। ১৯৬১ সালে গড়ে ওঠা বিচিত্রা বাড়ির বড়ো সংগ্রহশালায় ওই ঘড়িটি কাঁচের শো-কেসে স্থান পায়।

সামুরাই তরবারিটি ঐতিহাসিক নিদর্শন। সামুরাই যোদ্ধাদের ব্যবহৃত কারুকার্য খচিত দীর্ঘ ওই তরবারিটি ছিল রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তাঁকে ওই তরবারিটি উপহার দিয়েছিলেন জাপানের শিল্প ইতিহাসবিদ ও দার্শনিক ওকাকুরা কাকুজো। রবীন্দনাথের এক বছর আগেই মারা যান সুরেন্দ্রনাথ। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তরবারিটি সংগ্রহশালায় রাখেন। ১৯০২ সালে জাপান-ভারত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক তৈরির লক্ষ্যে ওকাকুরা কলকাতায় এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এবং প্রাচ্য ধর্ম মহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দকে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাতে। পরে ভগিনী নিবেদিতার প্রেরণায় ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন ওকাকুরা। তিনি দীর্ঘদিন কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে ছিলেন। ওই সম্পর্কের নিদর্শন হিসাবে তিনি তরবারিটি উপহার দেন সুরেন্দ্রনাথকে।

নোবেল চুরির খবর চাউর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ খোঁজ রব উঠল চারদিকে। মুহূর্তেই সাড়া পড়ে গেল পুরো ভারতবর্ষেই। ক্ষোভে ফেটে পড়ল অনেকেই। মোক্ষম একটা হাতিয়ার পেয়ে রাজনৈতিক কাঁদা ছোঁড়াছুড়িও হলো প্রচুর। তৃণমূল (সে সময়ের বিরোধী দল) নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চুরির দায় চাপালেন ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টের ওপর। ক্ষমতসীনেরাই বা বসে থাকবে কেন? তাই কেউ কেউ উলটো তৃণমূলকেই এই চুরির দোষ দিয়ে বসলেন। অনেকেই বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য সুজিত কুমার বসু ও প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর পদত্যাগের দাবিও তুলে ফেললেন।

পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এ চুরির ঘটনাকে ভয়ংকর হিসেবে আখ্যায়িত করলেন। তিনি বললেন, 'আমরা অবশ্যই এই কালপ্রিটদের গ্রেপ্তার করে নোবেল প্রাইজ ফেরত আনব। তা যে কোনো মূল্যেই হোক।' মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে খবর পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তদন্তের নির্দেশ দেন সিআইডিকে। হতাশা প্রকাশ করেন বিশ্বভারতীর আচার্য ও প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। ফোনে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে, আশ্বাস দেন সর্বোচ্চ সহযোগিতার। চুরির ঘটনায় রাষ্ট্রপতি আব্দুল কালাম আজাদ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সঙ্গে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে তুরন্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।

নোবেল চুরির খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সারা ভারত জুড়ে ওঠে ক্ষোভ। বিশ্বভারতীর আচার্য ও প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে। তৃণমূল কর্মীরা পরের বৃহস্পতিবার অনশনে বসে। এসএফআই মিছিল বের করে। প্রধান বিচারপতির আদালতে তিনটি আলাদা মামলা হয়। অমর্ত্য সেন, মহাশ্বেতা দেবী, শঙ্খ ঘোষ সবাই ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁরা অবিলম্বে উদ্ধারের দাবি জানান।

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই চুরির দায়িত্ব বামফ্রন্টের উপর চাপিয়ে দেন। আর ওদিকে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ মন্ত্রী ড. মুরালীমনোহর যোশী বলেন, তৃণমূল আর কমিউনিস্টদের অশ্রদ্ধাই এই চুরির জন্য দায়ী। যোশীর এই বক্তব্যের আবার তীব্র সমালোচনা করেন সিপিএমের তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস।

নোবেল চুরির ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করে সুইডেনের নোবেল কমিটি। নোবেল কমিটির মুখপাত্র মাইকেল শ্যোলম্যান বলেছিলেন, আমরা তো আর আসল নোবেল দিতে পারব না, বড়োজোর একটা ব্রোঞ্জ প্রতিরূপ দিতে পারি। আর মানপত্রের তো প্রতিরূপ দেওয়ার বিধান নেই।

নোবেল যাতে গলিয়ে ফেলতে না পারে সেজন্য রাজ্য জুড়ে সব স্বর্ণকারদের অনুরোধ জানানো হয়। বিশ্বভারতীর উপাচার্য সুজিত কুমার বসু চোরদের কাছে আবেদন জানান 'ওরা ওই সব মূল্যবান বস্তু আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিক। ওদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে। ওদের পরিচয় গোপন রাখা হবে, এটা জাতীয় লজ্জা।'

জীবন বাগদি নামে এক চোরের হাতের ছাপের মিল খুঁজে পায় সিআইডি। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিছুদিন পর জামিনে বেরিয়ে আসেন জীবন বাগদি। জামিনের কয়েকদিন পরেই রহস্যজনক ভাবে খুন হয় জীবন। অন্যদিকে, কলকাতার বরাহনগর বারুইপাড়া লেনের একটি বাড়িতে হানা দিয়ে উদ্ধার হয় ‘রবীন্দ্র ১৯৩৮’ লেখা ছবি-সহ বেশ কিছু মূল্যবান সামগ্রী। পরে প্রমাণিত হয় ওগুলো বিশ্বভারতী থেকে চুরি যাওয়া নয়, এসব অনেক আগে শান্তিপুর রাজবাড়ি থেকে চুরি যাওয়া জিনিস।

ইতিমধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনশনে বসে পড়েন। চাপে পড়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ঘটনার ছ'দিনের মাথাতেই চুরির তদন্তের দায়িত্ব চলে যায় সিবিআইয়ের হাতে। এই কলমজীবী তখন ‘ই-টিভি’র বর্ধমান ভি-স্যাটের ইনচার্জ। চুরির তিন দিন পরে হেডকোয়ার্টার হায়দরাবাদ থেকে নির্দেশ আসে অবিলম্বে শান্তিনিকেতন পৌঁছাতে। শান্তিনিকেতন পৌঁছে দেখতে পাই বিচিত্রা ভবনের পেছনে, নাট্যঘরের পাশে, দোতলা সমান উঁচু বড়ো ফেন্সিঙের মোটা জাল কাটা। যেখান দিয়ে একজন মানুষ অনায়াসে গলে যেতে পারে। ওখান থেকে বারবার ঢুকে-বেরিয়ে টেলিভিশনে লাইভ করি। এর পরেই ওখান থেকে একটু দূরে লাল বাঁধের পাড়ে পাওয়া যায় যে বাক্সে নোবেল রাখা হয়েছিল সেই নোবেল রাখার লাল শালু।

ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা তদন্ত শুরু করে ১ এপ্রিল। ওই দিন রাতেই হয় এক কাণ্ড। সিবিআই উত্তরায়ণ চত্বরে সাদা তাঁবু গেড়ে ছিল। তাদের ক্যাম্প অফিস হয়েছিল রতনকুঠী। সেখানেই অফিসাররা থাকতেন। আমরা কলকাতার সাংবাদিকরা সবাই প্রায় এক হোটেলে থাকতাম। তখন অনেক রাত। সাংবাদিকরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি আর আলফা টিভির চয়ন কুণ্ডু শেষ শীতের রাতে হোটেলের ছাদে উষ্ণতা অনুভব করছিলাম। এমন সময় ছাদে উঠে এলেন, সেই সময় বোলপুর থানার এক অফিসার। খবর পেয়ে ওই নিশুতি রাতেই ছুটলাম রতনকুঠী। রতনকুঠী শুনশান। সিবিআই অফিসাররা সব নিদ্রা গেছেন। শুধু একটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে এক চিলতে আলো। বহু ডাকাডাকি পর যখন সাড়া দিলেন না কেউ, তখন ওই আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলাম। ভদ্রতার ঠক ঠকে যখন দরজা খুলল না তখন ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো। প্রায় লাথি মেরে খুলে ফেলা হলো দরজা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এক গোর্খা অফিসার। তিনি সিবিআইয়ের তদন্তকারী দলের ডিএসপি। আমাদের দেখে হতভম্ব। পুরোটা বুঝিয়ে বলতে হেসে ফেললেন। ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে দেখলাম গোটা ঘর অন্ধকার। টেবিলের উপর একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। টেবিলের উপর ছড়ানো হরেক সামগ্রী। তার মধ্যে মৃণালিনীদেবীর শাড়ি। তিনি তালিকা তৈরি করছেন।

আসলে হয়েছে কী, সিবিআই তদন্ত শুরু করার দিনই সন্ধ্যায় উত্তরায়ণ চত্বরের পিছনে থেকে উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া হাতির দাঁতের তৈরি বেশ কিছু সামগ্রী। যা মিউজিয়ামের এক কোণে একটি কাপড়ের পুটুলিতে রাখা ছিল। এই উদ্ধারের পর সিবিআই নিশ্চিত এর সঙ্গে বিশ্বভারতীর কেউ না কেউ জড়িত। কিন্তু কে জড়িত তা শনাক্ত করতে তারা ব্যর্থ হয়। এরই মধ্যে ঘটে কয়েকটি মজার ঘটনা।

একটা সামান্যতম সূত্র খুঁজতে তন্নতন্ন করে ছুটে বেড়াচ্ছেন তদন্তকারীরা। সেই সময় একদিন তাঁরা এক মহিলার ফোন পান। ফোনে মহিলা জানালেন, কে নোবেল চুরি করেছে এবং ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত, তিনি সেটা জানেন। হাতে চাঁদ পেল তদন্তকারী দল।

দীর্ঘ কথার পর ঠিক হলো নানুর-কাটোয়া বাস রুটের একটি গ্রামের বাসস্টপে ডাকা হবে সেই ‘নোবেল চোর’কে। মহিলাই চিহ্নিত করে দেবেন তাকে। সেই মতো নির্দিষ্ট দিনে ধরা পড়ল ‘নোবেল চোর’। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দফায় দফায় জেরা চলল। অবশেষে তদন্তকারী দল নিশ্চিত হলেন— ওই মহিলার সঙ্গে এই যুবকের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ওই যুবককে বিয়ে করার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন মহিলা, আর যুবক নিজে স্বাবলম্বী হবার জন্য আরও একটু সময় চাইছিলেন। তাই তাকে ‘উচিত শিক্ষা’ দেবার জন্যই সিবিআইকে দিয়ে নোবেল চোর সাজাবার পরিকল্পনা করেন মহিলা।

ঘোষিত পুরস্কারের লোভে দাগি চোরেদের নাম বলে দিয়ে বাজিমাত করতে চেয়েছেন বহু মানুষ। এমনকী পরিচিত শত্রুকে ফাঁসানোর জন্য সিবিআইয়ের কাছে ফোন করে অনেকে নোবেল-চোর সম্পর্কে গোপন খবরও দিয়েছেন। আর এইসব খবরের ওপর ভিত্তি করে, তদন্তে ঝাঁপিয়ে শেষমেশ নিরাশ হতে হয়েছে সিবিআইয়ের গোয়েন্দাদের। একসময় বিষয়টি এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে, ঘোষিত টেলিফোন নম্বরটি প্রত্যাহার করে নেয় সিবিআই।

আসলে ভুয়ো খবরের পিছনে ছুটতে গিয়ে বহু ক্ষেত্রে সিবিআইয়ের তদন্তের অভিমুখ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। ফলে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এক সিবিআই অফিসারের কথায়, ‘বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমন সুন্দর গল্প সাজিয়ে আমাদের খবর দেওয়া হতো যে আমরা সেগুলোর তথ্য তল্লাশ করতাম। শেষ পর্যন্ত দেখা যেত, ব্যক্তিগত রাগ মেটাতে অনেকেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে খবর দিত সিবিআই-কে।’

এমনই এক খবরের তথ্য-তলাশ শেষে ক্ষোভের বদলে হাসিতে ফেটে পড়েছিলেন কয়েকজন অফিসার। ফোনে পাওয়া খবরের ওপর ভিত্তি করে বর্ধমান থেকে এক স্কুলশিক্ষককে তুলে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন সিবিআইয়ের অফিসারেরা। ওই শিক্ষক মাঝেমধ্যেই শান্তিনিকেতন আসতেন। অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর, কোনও সূত্র না পেয়ে হতাশ অফিসারেরা খবরদাতার নাম নিয়ে ফেলেন সন্দেহভাজন শিক্ষকের সামনে। সেই নাম শুনে সন্দেহভাজনের ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। পরে তিনি স্বীকার করে নেন যে, ফোনে যে-ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে খবর দিয়েছেন, সেই ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ‘গোপন সম্পর্ক’ সম্প্রতি জানাজানি হয়ে যায়!

‘গাড়ি-বাড়ি যা চাইবি কিনে দেব। শুধু বলে দে, কে চুরি করেছিস!’ এই কথা শুনে ভিরমি খাওয়ার জোগাড় ৪৯ বছরের নীতা দেবীর। কী বলছেন বাবুরা? উলটোদিকে বসে দু-জন। কাঁধে অশোক স্তম্ভ। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে তার দিকে। উত্তরের প্রত্যাশায়। মাথা নীচু করে বসে নীতা দেবী। উত্তর তার জানা নেই। তবুও হাল ছাড়তে নারাজ উলটোদিকে বসা দুই দুঁদে আইপিএস অফিসার। সেই ডিসেম্বর মাসের ১৯ তারিখ, লায়েক বাজারের শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে তুলে এনেছিল পুলিশবাবুরা। তারপর থেকে একটাই প্রশ্ন—

কে চুরিটা করেছিল, প্রথমে বুঝতে না পারলেও, পরে নীতা দেবী বুঝেছেন যে, পুলিশবাবুরা চুরি হয়ে যাওয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কারটা খুঁজছেন।

চারদিন টানা জিজ্ঞাসাবাদের পর যখন কিছু পাওয়া গেল না, তখন নীতা দেবীকে নিয়ে বিহার পাড়ি দেয় গোয়েন্দারা। নীতা দেবীর স্বামী তপনের খোঁজে। রঘুনাথপুর থেকে তপনকে নিয়ে সোজা হাজির বোলপুরের এসডিপি অফিসে। আবার একপ্রস্থ জেরা তপনকে। গোয়েন্দাদের বিশ্বাস ছিল যে, রবীন্দ্রনাথের নোবেল চুরি করা ব্যক্তিদের সম্পর্কে ধারণা আছে দাস দম্পতির। কয়েকদিন জিজ্ঞাসাবাদের পরই, গোয়েন্দারা বুঝতে পারেন যে, দাস দম্পতির কাছে নোবেল চুরি নিয়ে বিশেষ কোনও খোঁজ নেই। ফলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। দাস দম্পতির মতো প্রায় ৩০ জনের সঙ্গে কথা বলেও আসল নোবেল চোরের হদিশ করতে পারেননি গোয়েন্দারা।

এই রকম ঘটনা একটা নয়, বহু হয়েছে তদন্তকারীদের সঙ্গে। এই কলমচি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত। তার ওপর ওই সময় বিশ্বভারতীর একটি কমিটির সদস্য। আশ্রম বন্ধু-বাসিন্দা। ফলে ২৫ মার্চের সকাল থেকেই এই ঘটনার সাক্ষী থাকার সুযোগ হয়েছিল। রাজ্য পুলিশ, সিআইডি, সিবিআই— পর্যায়ক্রমে তদন্ত করেছে। সফলতা কি আসেনি? 'না' কী করে বলি? যেমন রাজ্য পুলিশ বীরভূম জেলার দুবরাজপুর এলাকা থেকে একজনকে ধরেছিল, যার হাতের তালুর ছাপ মিলে গিয়েছিল ঘটনাস্থলে পাওয়া ফিঙ্গারপ্রিন্টের সঙ্গে। এর প্রায় ১২ বছর পর এই নোবেল চুরির বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা জানিয়েছিল সিবিআই, সিআইডি এবং রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের গঠিত সমন্বিত সেল।

নোবেল চোর ধরার জন্য এরপরই উঠে পড়ে লাগে ভারতের প্রতিটি গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই, সিআইডি থেকে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। সবাই আদাজল খেয়ে লেগে যায় নোবেল চোর এবং চুরি যাওয়া নোবেল পদকের সন্ধানে। কিন্তু কোনোভাবেই এই চুরির কিনারা করতে পারছিল না কেউই।

সিবিআই ২০০৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর বোলপুরের অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তদন্ত শেষে এক রিপোর্টে জানিয়ে দেয়, সিবিআই চুরির কিনারা করতে পারেনি। পরের বছর আবার সিবিআই আবেদন করে জানায়, তারা ফের এই তদন্ত করবে। আদালত তাতে অনুমতি দেয়। কিন্তু কার্যত সিবিআই আবার ব্যর্থ হয় নোবেল চুরির কিনারা করতে। ২০০৭ সালের জুলাই মাসে চঞ্চল কুমার জানা নামে এক অধ্যাপক কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করে আর্জি জানান, সিবিআই যখন এই নোবেল চুরির কিনারা করতে পারেনি, তখন এই তদন্তভার রাজ্য পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডি-র হাতে তুলে দেওয়া হোক। সেই মামলার শুনানি হয়। নোবেল চুরি কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে অগ্নিশর্মা কলকাতা হাইকোর্ট। কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা সিবিআই-কে তুলোধনা করে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাকেশ কুমার তিওয়ারি ও বিচরপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চ। স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, না পারলে বলে দিন আপনারা অকর্মণ্য।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল চুরির তদন্তভার সিআইডি-কে দেওয়ার আর্জিতে হাইকোর্ট দায়ের হওয়া একটি জনস্বার্থ মামলায় সিবিআইকে রীতিমতো ভর্ৎসনা করে হাইকোর্ট। প্রশ্নে প্রশ্নে জেরবার অবস্থার সম্মুখীন হন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আইনজীবী। আদালত জানতে চায় দু'বার ফাইনাল রিপোর্ট জমা দেওয়ার পরও কেন অভিযুক্তের হদিশ নেই? তদন্তের রিপোর্ট দিতে এত গড়িমসির কারণ কী? এমনকী, আদালত এও প্রশ্ন করে, সিআইডি তদন্ত করলে সিবিআইয়ের আপত্তি কোথায়?

এরপরই আদলত বলে, আপনারা ব্যর্থ বলেই সিআইডি তদন্তভার নিতে চাইছে। এক সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয় আদালতের পক্ষে। একই সঙ্গে জানতে চায় ১৩ বছর ধরে যে তদন্তের কিনারা করতে পারেনি, সেই তদন্তভার পশ্চিমবঙ্গের সিআইডির হাতে তুলে দিতে বাধা কোথায়?

কর্মজীবনের শেষ দিনে কলকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি রাকেশ তেওয়ারি বলেছিলেন, সিবিআই না পারলে ছেড়ে দিক। পাশাপাশি, এই দীর্ঘসূত্রতাকে এককথায় ব্যর্থতা বলেই তিনি মন্তব্য করেন। ভর্ৎসনা করেন সিবিআইকে। ডিভিশন বেঞ্চের অপর বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন বলেন, সিবিআই ইতিমধ্যে দু'বার চুরির তদন্তে কুলকিনারা পাওয়া যাচ্ছে না বলে তদন্ত বন্ধের আবেদন জানিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে আদালতে জানানো হয়, রাজ্য পুলিশের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্যসূত্র আছে, যা দিয়ে এ তদন্তের কিনারা করা যাবে। ২০১০-এর ৫ আগস্ট সিবিআই আদালতে জমা দেওয়া তাদের চূড়ান্ত রিপোর্টে চুরির রহস্য উন্মোচনে ব্যর্থতার কথা জানায়।

তদন্তের অগ্রগতিও একেবারে শূন্যের কোঠায়। নোবেল চুরির বছর থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত টানা পাঁচ বছর তদন্ত অগ্রগতি প্রায় শূন্য। সফলতা বলতে ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একজনকে নোবেল চোর সন্দেহে ঢাকার আজিমপুর থেকে গ্রেপ্তার করে বাংলাদেশের সিআইডি। কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয় না। পাওয়া গেল না কোনো কিছুই। শেষমেশ বিশ্বকবির নোবেল পদকের আসল চোর ধরতে ব্যর্থ হয়ে ২০১০ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে নোবেল চুরির কেসের তদন্তের দরজা বন্ধ করে দেয় সিবিআই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পাওয়ার শতবার্ষিকী পেরিয়ে গেছে কয়েক বছর আগেই। আর ২০২২ সালে নোবেল চুরি যাওয়ার প্রায় দুই যুগও পেরিয়ে গেল! এখন পর্যন্ত নোবেল পদক উদ্ধার কিংবা চোর ধরা পড়া তো দূরে থাক, ঠিক কী উদ্দেশ্যে চোর সেটা চুরি করেছে, সেটাই জানা যায়নি। কীভাবে তারা চুরি করল, কেন চুরি করল, চুরি করে তারা কোথায়ই-বা হাওয়া হয়ে গেল, নোবেলের সোনার পদকটি দিয়ে তারা ঠিক কী করল, সেটা আজ আবধি এক বিরাট রহস্য! এই রহস্য কি আরও ১০০ বছরেও রহস্যই থেকে যাবে? নাকি কখনও পাওয়া যাবে হারিয়ে যাওয়া নোবেল? এ প্রশ্নের জবাব কারও কাছেই নেই। তবে চুরি যাওয়া বিশ্বকবির নোবেল পুরস্কার, যা কিনা বাঙ্গালির জাতীয় গর্ব, তা আজ শুধু পীড়া দেয় বাঙ্গালিদের। যে পীড়াকে কবি শঙ্খ ঘোষ আখ্যা দিয়েছিলেন, 'জাতীয় সর্বনাশ'।

যেদিন নোবেল-সহ অন্যান্য জিনিস শান্তিনিকেতন থেকে চুরি যায়, সেদিন ওখানে

গার্ডের সংখ্যা ছিল মোটে দুজন। নিরাপত্তার এই খামখেয়ালিপনার কারণেই নোবেল পদক চুরি গেছে—এ রকম দাবি তুলে বিশ্বভারতীকে অনেকেই নানাভাবে দুষেছেন সে সময়। এমনকী এখনো দুষেই চলেছেন কেউ কেউ। কিন্তু তাতেই-বা কী। তাতে তো আর আসল নোবেলটা পাওয়া যাবে না। সুইডিশ কর্তৃপক্ষ অবশ্য নোবেলের একটা রেপ্লিকা প্রদান করেছেন। কিন্তু, নকল দিয়ে তো আর চুরির ক্ষত মেটানো যায় না। আসল তো আসলই।

২০১৬ সালের ৫ আগস্ট। বৃহস্পতিবার। আজকের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বভারতীতে এসে বললেন, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর কোনও প্রশাসনিক সম্পর্ক নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে 'সেন্টিমেন্ট' আছে। তিনি বিশ্বাস করেন, ওই আবেগ তাঁর একার নয়। গোটা বাঙ্গলার মানুষের। সেই রবি ঠাকুরের নোবেল পদক চুরি গিয়েছে বারো বছর হয়ে গেল। কোনও কিনারা হলো না। বলেন, 'নোবেল চুরির তদন্তে সিবিআই কী করল জানি না। ওরা না পারলে আমি যদি তদন্তের সুযোগ পাই, খুঁজে বার করবই।'

বীরভূমে প্রশাসনিক বৈঠকের পর্ব মেটার পরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য স্বপন দত্তের আমন্ত্রণে সেদিন বিকেলে লিপিকা সদনে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই শিক্ষক- শিক্ষিক-পড়ুয়াদের সামনে তিনি বলেন, 'খুব খারাপ লাগে যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পদক চুরি হয়ে যায়...।' পদকের একটি রেপ্লিকা এখন রাখা হয়েছে বিশ্বভারতীতে। সিবিআই দু'দফায় তদন্ত চালিয়েও মূল পদকের খোঁজ পায়নি। আদালতের অনুমতি নিয়ে তদন্ত বন্ধ করেছে তারা। সেই কারণেই ওইদিন তাঁর হতাশা ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। সুযোগ পেলে যে তিনি শেষ চেষ্টা করে দেখতে চান, জানান সে কথাও। এর পরেই মমতা যোগ করেন, 'কথাটা বললাম, কারণ আমার কাছে রবীন্দ্রনাথ একটা সেন্টিমেন্ট। তাঁর (রবীন্দ্রনাথ) সম্মান শুধু বাঙ্গলার নয়, গেটা বিশ্বের।

২০০৪ সলের ২৫ মার্চ সকালে জানা যায়, রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহশালা থেকে নোবেল পদক-সহ মোট ৩৭টি মূল্যবান জিনিস চুরি গিয়েছে। প্রথম দফায় ২০০৭ সালের আগস্টে তদন্ত গুটিয়ে নেয় সিবিআই। তারপরে আবার নতুন সূত্র মিলেছে বলে জানিয়ে ২০০৮-এর সেপ্টেম্বরে আদালতে আবার তদন্তের আবেদন জানায় তারা। লাভ হয়নি। কারণ তদন্তে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি, এই যুক্তিতে ২০০৯-এর আগস্টে ফের সিবিআই তদন্ত বন্ধ রাখার আবেদন করে। ২০২০-এর ৫ আগস্ট আদালত সিবিআইকে সেই অনুমতি দেয়। সিবিআই জানিয়েছিল, এ ব্যাপারে আবর নতুন করে কোনও সূত্র বিললে তারা ফের তদন্ত শুরু করতে পারে।

সেই শেষ। নোবেল চুরির তদন্তে আর কোনও নাড়াচাড়া হয়নি। সিবিআই সূত্রের দাবি, চুরি যাওয়া নোবেল পদক সম্পর্কে তথ্য দিতে পারলে ১০ লক্ষ টাকার পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছিল। সাহায্য চাওয়া হয়েছিল 'ইন্টারপোল'-এর। তবে তাতেও কাজ হয়নি। সিবিআইয়ের এক কর্তা জানিয়েছেন, তাঁদের অনুমান ছিল, ভিনদেশে পাচার হয়ে গিয়েছে নোবেল পদক। পদকটি হয় গলিয়ে ফেলা হয়েছে বা নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। তবে এগুলো অনুমানই। সরকারি ভাবে নোবেল পদকের ঠিক কী হয়েছে তা স্পষ্ট করে জানায়নি সিবিআই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই প্রসঙ্গই সামনে এনেছিলেন। রাজ্য সরকার তদন্ত চালালে সাফল্য আসবে বলে আশ্বাসও দিয়েছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস শুনে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য স্বপন দত্ত বলেছিলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যদি তদন্ত চালিয়ে পদক উদ্ধার করতে পারেন, তাহলে সে উদ্যোগকে স্বাগত। 'পদক ফেরত আনতে পারলে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবেন বলে জানিয়েছিলেন প্রবীণ আশ্রমিক তথা পাঠভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সুপ্রিয় ঠাকুরও।

সিআইডি অফিসাররা অনেকে মনে করেন, নোবেল পাচারের 'নাটের গুরু' ছিলেন বাংলাদেশের স্বর্ণ ব্যবসায়ী মুহাম্মদ হোসেন শিপলু এবং ভারতীয় ব্যবসায়ী জীবন সিং। এছাড়া ওই দুজনের সঙ্গে এক ইউরোপীয় পাচারকারীরও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল বলে জানান এক সিআইডি কর্তা। এছাড়া টেলিফোন রেকর্ড এবং অন্যান্য সূত্রে গোয়েন্দারা নিশ্চিত হন শান্তিনিকেতনে বসে বিচিত্রা বাড়িতে চুরির ছক কষে ওই 'নাটের গুরু'। চোরাচালান চক্রের অন্যদের জানায়। বাংলাদেশ ও ইউরোপের বিভিন্ন জায়গার বাসিন্দারা এর সঙ্গে যুক্ত। ওই চোরাচালান চক্রের ষড়যন্ত্রীদের সঙ্গে ফোনে আলোচনা করেই ওই ব্যক্তি নোবেল চুরির ছক কষে। এছাড়া ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক বিদেশি ব্যক্তির সম্পৃক্ততাও জানতে পারেন গোয়েন্দারা। প্রাথমিক ভাবে ওই ব্যক্তি জার্মানি বা ইউরোপের জন্য কোনো দেশের নাগরিক বলে সন্দেহ গোয়েন্দাদের।

নোবেল চুরির তদন্তভার হাতে নেওয়ার আগেই ওই নাটের গুরুর সন্ধান শুরু করে সিবিআই। এক ইউরোপীয় ২০০৪ সালে শান্তিনিকেতনের 'বিচিত্রা'র সংগ্রহশালা থেকে নোবেল চুরির 'মাস্টর প্ল্যান' করে, এমন ইঙ্গিত আগেই পেয়েছিল সিবিআই। সেই সূত্র ধরে তদন্ত চালায় তাঁরা। এমনকী, নোবেল ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিসপত্র চুরি করার পরিকল্পনা নিয়েই কাজে নেমেছিল ওই চোররা, ওই বিষয়েও নিশ্চিত হন তদন্তকারীরা। ওই আন্তর্জাতিক পাচারকরী দলের লক্ষ্য ছিল, চোরাপথে নোবেল এবং অন্য প্রত্নতত্ত্বিক নিদর্শনগুলো পাচার করে প্রথমে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া। সেখান থেকেই নোবেল চোরাপথে ইতালি বা জার্মানির মতো ইউরোপের কোনো দেশে পাচার করা, এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না গোয়েন্দারা। আবার হাত ঘুরে নোবেল আবার এই দেশেই ফিরে এসেছে, এমন সম্ভাবনাও রয়েছে অনেকেই মনে করেন। গোয়েন্দাদের কাছে আসা খবর অনুযায়ী, ২০০৪ সালের মার্চ মাসে নোবেল চুরির আগে 'বিচিত্রা'র সংগ্রহশালায় বেশ কয়েকজন বিদেশিকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছিল। পর্যটক হিসেবেই তাঁরা সংগ্রহশালায় ঘুরে দেখেন।

নোবেল চুরির মূল ষড়যন্ত্রকারী ওই দলের সঙ্গে 'বিচিত্রা'য় গিয়েছিলেন, এমন সম্ভাবনা রয়েছে। আবার ওই ষড়যন্ত্রকারী একাও একাধিকবার ওই সংগ্রহশালা ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করেন, এমন সম্ভাবনা গোয়েন্দারা উড়িয়ে দিচ্ছেন না। প্রাথমিকভাবে গোয়েন্দাদের কাছে খবর, ওই জনৈক নোবেল চুরির সময়ে শান্তিনিকেতনের কোনো হোটেল বা গেস্টহাউসে ছিলেন। এই তথ্যের সূত্র ধরে তদন্ত হাতে নেওয়ার পর বোলপুরের বড়ো

হোটেল ও গেস্টহাউসগুলোতে গিয়ে ওই বিদেশিকে শনাক্তকরণের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যাটি হলো, ২০০৪ সালে বহু হোটেলেই সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল না। এত বছর আগেকার হোটেলের রেজিস্টার কর্তৃপক্ষ রেখে দিয়েছেন কি না, তা নিয়েও ছিল সন্দেহ। যথারীতি পাওয়া যায়নি।

এর আগে নোবেল চুরির ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে প্রদীপ বাউরি নামে এক বাউল গায়ককে গ্রেপ্তার করেছিল গোয়েন্দারা। সঞ্জয় হাজরা নামে বোলপুরের আরেক বাসিন্দাকে আটক করা হয়েছিল। রূপপুর পঞ্চায়েতের মোলডাঙা গ্রামে বাড়ি প্রদীপ বাউড়ির। ভোর তিনটের সময় বাড়ি থেকে ওই বাউল শিল্পীকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি-র ৬ সদস্যের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম। বিশেষ তদন্তকারী দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তারা প্রায় নিশ্চিত যে ২০০৪ সালের ২৫ মার্চ নোবেল-চুরির ঘটনার সঙ্গে প্রদীপ বাউল ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। শুধু তাই নয়, ওই ঘটনায় বাকি অভিযুক্তদের নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিল প্রদীপ। চোরেদের পালানোর সুযোগও তিনিই করে দিয়েছিলেন। ১৯৯৮ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত শান্তিনিকেতন থানার রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন প্রদীপ বাউরি। সিআইডি অফিসারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, নার্কো অ্যানালিসিস টেস্টের জন্য গুজরাটে নিয়ে যাওয়া হয় প্রদীপকে। তাকে জেরার সময় সঞ্জয় হাজরার নাম উঠে আসে। বোলপুরে তার বাড়িতে থেকে সঞ্জয়কে আটক কর হয়। যথারীতি জিজ্ঞাসাবাদ চলে।

এছাড়াও নোবেল চুরির ঘটনায় যুক্ত থাকার আরও বেশ কয়েকজনের নাম জানিয়েছিল প্রদীপ বাউরি। তাদের খোঁজে বোলপুরে তল্লাশি চালান গোয়েন্দা আধিকারকরা। বাউরি ও হাজরা দুজনেরই 'ফিঙ্গার প্রিন্ট' নেওয়া হয়। ১৯৯৮ থেকে ২০০৩ সল পর্যন্ত প্রদীপ বাউরি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন। যে দুষ্কৃতীরা নোবেল চুরি করে তাদের আশ্রয় দেয় বাউরি এবং তাদের রাজ্য থেকে পালাতেও সাহায্য করে। তাকে জেরা করে জানা যায়, বাংলাদেশের নাগরিক মহম্মদ হোসেন এই পুরো ঘটনার মূল চক্রী ছিল। এছাড়া দু'জন ইউরোপিয়ানের সঙ্গেই যুক্ত ছিল।

কিন্তু হাল ছেড়েছিল সিবিআই। কোনও ঘটনা ঘটলে লোকাল ক্রিমিনালদের একটা যোগ থাকেই। লোকাল সোর্স আর লোকাল ক্রিমিনালরা সেটার লিঙ্ক তাদের পরিচিত তদন্তকারীদের হাতে তুলে দেন। শান্তিনিকেতনে সিবিআইয়ের কিছুই ছিল না। না তাদের লোকাল কোনও সোর্স ছিল, না তাদের হাতে স্থানীয় ক্রিমিনাল রেকর্ড ছিল; —যাদের ওপর ভরসা করে প্রাথমিক পর্যায়ে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত। দলে স্থানীয় কোনো অফিসার থাকলে যেমন সহজেই কোনও জায়গায় পৌঁছতে সুবিধা হয় ও স্থানীয় মানুষের সঙ্গে মেশা ও তথ্য সংগ্রহে সুবিধা হয়। সিবিআইকে সেই পথে যেতে দেখা যায়নি। উপরন্তু দেখা যায় তদন্তে যাঁরা করতে এলেন তাঁরা কেউ এলাকাটিই চেনেন না। ফলে, ভুলভুলাইয়ায় আটকে গেল সিবিআই। আর দুষ্কৃতীরা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি সময় পেয়ে গেল অপরাধ ও চুরি যাওয়া সামগ্রী লুকিয়ে ফেলতে।

এদিকে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে গিয়ে ধরে ধরে সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। গাড়ির ড্রাইভার, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী, কর্মী থেকে শুরু করে শহরের এক সাংবদিক, রবীন্দ্র ভবনের গবেষক, বাদ যাননি কেউই। কিন্তু প্রাপ্তির ভাঁড়ার শূন্য। বছরের পর বছর ধরে তদন্ত করেও উল্লেখযোগ্য কোনও সাফল্য দেখাতে পারলেন না তাঁরা। যার ফলে কয়েকবছর পর 'তদন্তে কোনও অগ্রগতি না হওয়ায়' আদালতে 'তদন্ত সাময়িক বন্ধের' আবেদন করতে বাধ্য হয় সিবিআই। তারা জানায়, 'গুরুত্বপূর্ণ সূত্র' পেলে আবার তদন্ত শুরু করবে। যদিও সেই 'গুরুত্বপূর্ণ সূত্র' কী, আদৌ সেটা মিলবে কি সে নিয়ে কোনও কিছু খোলসা করেনি তারা।

সিবিআই নোবেল উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল তদন্ত। আর সেখান থেকেই শুরু করেছিলেন রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দারা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন রাজ্যকে এই তদন্তে দায়িত্ব দেওয়া হলে তারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চুরি চাওয়া নোবেল পুরস্কার উদ্ধারের চেষ্টা করবেন। এরপরই 'সিট' গঠন করা হয়। ঘোষণা আগেই করেছিলেন। এবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ কাজও শুরু করে 'সিট'। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে আশ্বাসের ২৮ দিনের মাথায় নোবেল চুরির তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল গড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। ৩ সদস্যের তদন্ত দলে ছিলেন তৎকালীন কলকাতা পুলিশের কমিশনার রাজীব কুমার, তখনকার আইজি সিআইডি টু জাভেদ শামিম এবং তদানীন্তন সিআইডি'র এডিজি রাজেশ কুমার। নোবেল চুরি নিয়ে রাজীব কুমারের হাতে বেশ কিছু তথ্যও রয়েছে। যা তদন্তের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে বলে অনেকে মনে করতে থাকেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নোবেল তদন্ত রাজ্য শুরু করতে চায় বলার পর সাধারণ মানুষ আবার আশার আলো দেখতে পান। কিন্তু সিবিআই এখনও নোবেল চুরির তদন্ত রাজ্যকে হস্তান্তর করতে রাজি নয়। ফলে, নোবেল তদন্ত আদৌ কিছু হবে কী না, বা হলে কী হবে, সে নিয়ে সব প্রশ্নের উত্তর বিশ বাঁও জলে।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার খুঁজে পাওয়া নিয়ে সিবিআইয়ের সামনে কোনও আশার আলো নেই। দু-দুবার আদালতের কাছে ক্লোজার রিপোর্ট পেশ করেছে সিবিআই। এই মুহূর্তে সিবিআইয়ের কাছে কোনও 'লিড' নেই এই মামলার তদন্তে। ফলে তারা এই মুহূর্তে বিষয়টি নিয়ে কোনও কাজই করছে না। জানিয়েছেন সিবিআইয়ের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। আশ্চর্য হলেও এটা ঠিক, সিবিআই, সিআইডি এবং রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ-সহ ভারত সরকারের প্রায় সব গোয়েন্দা এজেন্সি মাঠে নেমে তদন্ত করলেও গত ১৮ বছরেও এই চুরির কোনো কিনারা করতে পারেনি। উদ্ধার করতে পারেনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চুরি যাওয়া নোবেল।

পরিশেষে, একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, যে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু থেকেই ভুলে ভরা, সেই তদন্তে কি আদৌ সাফল্য পাওয়া কোনওদিন সম্ভব? আবার একটা পঁচিশে বৈশাখ এল। এবারও ভারতবাসীর লজ্জা মোচন করা গেল না। গালভরা নামের গোয়েন্দা এজেন্সিগুলো পরাজিত। যেমন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু রহস্য রহস্যই থেকে গেছে। আজও সমাধান হয়নি। তেমনই ভারতীয় ইতিহাসে নোবেল চুরি রহস্য 'ন্যাশনাল মিস্ট্রি'! □

সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে বিএসএফ-এর সঙ্গে বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দু'দিনের পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে গত ৬ মে কোচবিহারে সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠক সারলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ওই দিন তিনি মেখলিগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের তিন বিঘায় পৌঁছে বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ঘণ্টা খানেক বৈঠকের শেষে তিনবিঘা করিডর পরিদর্শন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এরপর তিনি কুচলিবাড়ির জিগাবাড়ির বিওপি-তে যান। সীমান্তে কী কী সমস্যা রয়েছে, সীমান্ত নিরপত্তা সুরক্ষিত করতে আরও কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন এবং অনুপ্রবেশ নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই পরিদর্শন উপলক্ষ্যে তিনবিঘা করিডরে বিএসএফ ও পুলিশের তৎপরতা ছিল। বাংলাদেশের দহগ্রাম অঙ্গারপোতার সঙ্গে পাটগ্রাম-সহ বাংলাদেশের মূলখণ্ডে যোগাযোগকারী তিনবিঘা করিডরে সাধারণ মানুষের প্রবেশ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ ছিল। এই করিডরের কিছুটা দূরে হেলিপ্যাড গ্রাউন্ড। সেখানেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হেলিকপ্টার নামার ব্যবস্থা করা হয়।

কান চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ সম্মান ভারতকে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ এ বছর কান চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ সম্মান পেল ভারত। চলতি মাসের ১৭ তারিখ থেকে ফ্রান্সে শুরু হচ্ছে

কান চলচ্চিত্র উৎসব। এই উৎসবে 'কান্ট্রি অব অনার' হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে ভারতকে। ভারত-ফ্রান্সের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তির উপলক্ষ্যে ভারতকে এই বিশেষ সম্মান দিল ফরাসি সরকার। কান চলচ্চিত্র উৎসব। এ বছর কান চলচ্চিত্র উৎসবে ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হবে আর মাধবন অভিনীত 'রকেট্রি' ছবিটির। ভারতের আইকনিক চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবির বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্যোগ নিয়েছেন উদ্যোক্তারা। একটি সাংবাদিক বৈঠকে এ খবর জানান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। তিনি জানান ১৯৭০ সালে তৈরি ছবিটি মূলত সামাজিক অস্থিরতার মধ্যে আটকে পড়া একজন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের গল্প বলে। এই ছবিটি চলচ্চিত্র উৎসবের ক্লাসিক বিভাগে দেখানো হবে।

এবছর আন্তর্জাতিক কান চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। উৎসবে ন'জন জুড়ি বেছে নেবেন সেরা ছবি। ছবিটিকে পামে ডি'ওর পুরস্কারে সম্মানিত করা হবে। দীপিকার সঙ্গে ন'জনের প্যানেলে থাকছেন, রেবেকা হল, নুমি বেপেস, বিখ্যাত ইতালীয় পরিচালক জ্যাসমিন ট্রিঞ্চা, ইরানি পরিচালক আসগর ফরেদি, ফ্রান্সের এলআই, জেফ নিকোলাস এবং নরওয়ের থোয়াকিম ট্রায়ার। এই জুড়ি প্যানেলের নেতৃত্ব দেবেন ফরাসি অভিনেতা ভিনসেন্ট লিন্ডন। ২০২২-এর আন্তর্জাতিক কান চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হচ্ছে ১৭ মে থেকে। চলবে ২৮ মে পর্যন্ত।

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ৩০।।